মাসিক

আলোকধারা

রেজিঃ নং-২৭২
২৩ তম বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী

তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

মাসিক
আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং ২৭২, ২৩তম বর্ষ, ১২ সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০১৭ ঈসায়ী
রবিউস সানি-জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৯ হিজরি
পৌষ-মাঘ ১৪২৪ বাংলা

প্রকাশক
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

যোগাযোগ:
লেখা সংক্রান্ত: ০১৮১৮ ৭৪৯০৭৬
০১৭১৬ ৩৮৫০৫২
মুদ্রণ ও প্রচার সংক্রান্ত: ০১৮১৯ ৩৮০৮৫০
০১৭১১ ৩৩৫৬৯১

মূল্য : ১৫ টাকা
US $=2

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ্ শাহ্ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১। ফোন: ২৫৮৪৩২৫

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর একটি প্রকাশনা

Web:www.sufimaizbhandari.org.bd
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

■ **সম্পাদকীয়:**
----------২

■ **তাহ্কীকুল কুরআন ঃ সূরা আল বাক্বারাহ শরীফ (পর্ব-৮)**
অধ্যক্ষ আল্হাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী
----------৩

■ **প্রসঙ্গ ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপন**
আলোকধারা ডেস্ক----------৬

■ **গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়**
জহুর উল আলম----------১৫

■ **তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোতলাকার উৎস সন্ধানে**
জাবেদ বিন আলম----------২১

■ **মাইজভাণ্ডারী শরাফতের গাউসিয়াত-কুতুবিয়াতের খেলাফতের ধারাবাহিকতার কিছু প্রামাণ্য তথ্য ও শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)**
মোঃ মাহবুব উল আলম----------২৬

■ **কর্ম ও মর্মের আলোকে শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) [১৯২৮-১৯৮৮]**
ড. সেলিম জাহাঙ্গীর----------৩১

■ **ইসলামে নারীর অধিকার**
মুহাম্মদ নুর হোসাইন----------৩৮

■ **'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র বোধোদয়ের প্রত্যাশায়**
----------৪২

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি আয়োজিত সূফিতাত্ত্বিক মিলনমেলায় বক্তব্য রাখছেন: (বাঁ থেকে) ঢাকাস্থ সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর এমেরিটাস ড. এম. শমসের আলী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, চ.বি. আরবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ্, সাবেক সেনা প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অবঃ) এম. হারুন-অর রশিদ ও মাইজভাণ্ডারী একাডেমির সভাপতি প্রফেসর ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর পক্ষ হতে দুঃস্থদের মাঝে অর্থ বিতরণ করছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চট্টগ্রাম জনাব মোহাম্মদ রেজাউল মাসুদ।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট-এর পক্ষ হতে বন্যাদূর্গতদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদ সভাপতি আলহাজ্ব রেজাউল আলী জসিম চৌধুরী

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার ব্যবস্থাপনায় 'পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (দঃ), বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ৮৯তম মহান ১০ পৌষ খোশরোজ শরিফ ও চান্দ্রবার্ষিক ফাতেহা' উপলক্ষে আয়োজিত 'আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল'এ বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

সম্পাদকীয়...

১. আলোকধারা ডিসেম্বর ২০১৭ সংখ্যা প্রকাশের প্রস্তুতি পর্বে খাইরে খালকিহী, বিশ্ব রবি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর বেলাদত এবং ওফাত শরিফের স্মরণীয় তারিখ ১২ রবিউল আউয়াল অতিবাহিত হয়েছে। দিনটি আনন্দঘন পবিত্র বেলাদত (ভূমিষ্ঠ) এবং অন্তর্ভেদী শোকাবহ বেচাল শরিফ হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীবাসী দিনটিকে ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) হিসেবে পালন করে থাকেন। প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানের বিশ্বাসগত আক্বীদা হচ্ছে মহানবী (দঃ) হলেন হায়াতুন্নবী (দঃ)। পৃথিবীবাসীর মুক্তির দিশারী হিসেবে তিনি মাত্র ৬৩ বৎসর দুনিয়ার বুকে অবস্থান করলেও বস্তুতপক্ষে মহানবী (দঃ) আবেদান-আবেদা হায়াত নিয়ে অনন্ত জীবনপ্রাপ্ত হয়ে লোক চক্ষুর অন্তরালে পর্দারত আছেন। তাঁর অনন্ত হায়াতের বস্তুনিষ্ঠ নমুনা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক সালাত কায়েমের আহ্বান লক্ষ্যে প্রতিদিন পাঁচবার পৃথিবীর প্রতিটি মসজিদে সুললিত মনোহরী কণ্ঠে উচ্চারিত 'আযান'। এমন একটি অপরিবর্তনীয় প্রশংসাসূচক হৃদয়গ্রাহী 'আওয়াজ' যা মহানবী (দঃ) পৃথিবীতে অবস্থানকালে চালু করেছিলেন। কালের গতি প্রবাহে মুসলিম সমাজের জীবনবাদে নানামুখি পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটলেও আযানের প্রতিটি শব্দ রয়েছে সূচনা থেকে অবিকল এবং অপরিবর্তনীয়। নানা মতবাদ, ফেরকা ফিতনার জঞ্জালে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত এবং অনৈক্যের কারণে অপমানজনক অবস্থায় নিমজ্জিত মুসলিম জনগোষ্ঠীর ঐক্যের একক সূত্র হচ্চে আযান। প্রতিদিন পাঁচটি নির্ধারিত সময়ে দিবারাত্রির গতি প্রবাহের সঞ্চালন ধারায় পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে সালাতের জন্য আহ্বান ধ্বনি আযানে দু'বার করে বাধ্যতামূলকভাবে 'মুহাম্মদর রাসূলুল্লাহ্' পবিত্র নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। একইভাবে ফরজ নামাযের পূর্বে তকবীর বা ইকামতের সময়ও দুবার করে মহানবী (দঃ) এর পবিত্র নাম মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে থাকে। সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর আবর্তনের কারণে রবি বিকিরণে তারতম্য থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় দিবারাত্রির সময় এবং মুহূর্তগত পার্থক্য থাকে। এ কারণে পৃথিবীর দেশে দেশে ঘড়ি ঘণ্টা এবং সময়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবধান থাকে। তাই মসজিদ এবং ইবাদতখানাসমূহে আযানের সময়েরও তারতম্য থাকে। দিবারাত্রি এবং সময়ের ব্যবধান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ পৃথিবীকে একটি মুহূর্তও আযান ব্যতীত রাখেননি। তাই প্রতিবার আযানের সময় অনুযায়ী প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্ এবং রাসূলুল্লাহ্র নাম যুগপৎ পবিত্রতার সঙ্গে পৃথিবীব্যাপী উচ্চারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ একমাত্র অবিনাশী সত্তা মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয়তম প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদকে (দঃ) তাঁর সঙ্গে অব্যাহতভাবে দিবারাত্রির সর্বক্ষণে শ্রদ্ধা, ভালবাসা এবং প্রশংসাবাণীতে উদ্ভাসিত রেখেছেন। এক কথায় মহান আল্লাহ্র নাম স্মরণের পাশাপাশি মহানবীর পবিত্র নাম প্রশংসার সঙ্গে উচ্চারণ ইসলাম ধর্মের শাশ্বত রীতিনীতিতে বাধ্যতামূলক হয়ে আছে। প্রকৃত ব্যাখ্যায় লক্ষ্য করা যায় আল্লাহ্ স্বয়ং প্রত্যাদেশ মারফত বিশ্ববাসীকে মহানবীর (দঃ) মাধ্যমে অবহিত করেছেন, "আমরা আপনার [মহানবী (দঃ)] স্মরণ বা আলোচনাকে উঁচু স্তরে উন্নীত করব" এ পবিত্র কালামের মাধ্যমে মহানবীর (দঃ) অনন্ত হায়াতের ঘোষণাই দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া পৃথিবী বিখ্যাত অনেক দরবেশ, মনীষী, ওলামা মদীনার পবিত্রতম বিশুদ্ধ মৃত্তিকার অভ্যন্তরে শায়িত মহানবীকে (দঃ) মৃত্তিকার উপরে অবস্থান নিতে বহুবার সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন। সুতরাং হায়াতুন্নবী হিসেবে যিনি মহান আল্লাহ্র দরবারে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, তাঁর স্মরণে এবং প্রশংসায় 'ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ)' উদ্‌যাপন বিশ্ববাসীর জন্যে একটি অনন্য আলোকিত ইবাদতের নির্দেশনা। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্ প্রেরিত একজন নবী এবং রাসূল। আল্লাহ্র সৃষ্টি জগতের সার্বিক ব্যবস্থাপনার আলোকে তিনিই একমাত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব অর্থাৎ 'ইনসানে কামিল'। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র পথে হেদায়তের পথ নির্দেশক নিযুক্ত হয়ে শুধুমাত্র ধ্যানমগ্নতাকে মানব মুক্তির একমাত্র পন্থা হিসেবে সীমাবদ্ধ করেননি, বরং সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত আচার আচরণে সুউচ্চ নৈতিক শুদ্ধতা অবলম্বনের মাধ্যমে চিরন্তন সত্য মহান আল্লাহ্কে সার্বক্ষণিক স্মরণে রেখে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশের ইহজাগতিক নির্দেশনাও সুস্পষ্ট করেছেন। পৃথিবীতে মানব জীবনবাদের জন্য আর কেউ এ ধরনের সর্বাঙ্গীণ নির্দেশনা দেননি। এ কারণে তিনি ইনসানে কামিল এবং সর্বাবস্থায় প্রশংসা বাক্যে স্মরণীয় হায়াতুন্নবী (দঃ) এবং মানব মুক্তির বিশুদ্ধ পথের একমাত্র দিশারী। আমরা অনন্ত সময়ব্যাপী বলব, "মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লে আলা-তুমি বাদশাহ্রও বাদশাহ্ কামলি ওয়ালা।" তাই হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হচ্ছেন উম্মতে মোহাম্মদীর ঐক্যের এবং আনুগত্য লাভের একক কেন্দ্রবিন্দু।

২৪ ডিসেম্বর ১০ পৌষ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাসাওউফ বিষয়ক মুখপত্র আলোকধারার অভিভাবক শাহানশাহ্ হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের পবিত্র খোশরোজ। মানব কল্যাণের লক্ষ্যে শুভ বার্তা নিয়ে পৃথিবীর বুকে যে সকল কামিল ইনসানের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁদের জন্মদিনকে আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে খোশরোজ হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। কারণ এ ধরণের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের পরশে মাটির মানুষ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রদর্শিত পথকে বলা হয়েছে, 'সীরাতুল মুস্তাকিম' তথা সহজ সরল আলোকিত পথ। এর বিপরীত পথ হচ্ছে 'বিভ্রান্ত এবং অভিশপ্তদের'। মনুষ্য ধারণা এবং কল্পনার অসীমত্বের চেয়েও অসীম অদৃশ্যে মহান স্রষ্টার অনন্ত অবস্থানের পথ নির্দেশক হচ্ছেন আল্লাহ্র পরম সান্নিধ্যপ্রাপ্ত আল্লাহ্র অলি দরবেশগণ।

এ ধরনের 'আবাদান-আবাদা' ধারার মর্যাদাপ্রাপ্ত একজন মহান দরবেশ হলেন শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। তাঁর পবিত্র খোশরোজে নিত্য নব উপলব্ধিতে তাই তিনি মানুষের নিকট স্মরণীয় এবং বরণীয় হয়ে ওঠেন বার বার। একথা বিশেষভাবে সত্য যে, তার প্রতি ভক্ত-অনুরক্তের ভালবাসা এবং আনুগত্য পরম মমতায় আবেগ উচ্ছ্বাসে ভরপুর। ঐশী প্রেমের জগতে আবেগের অবস্থান নিঃসন্দেহে একটি অনন্য মূখ্য উপাদান। তবে সকল ভক্ত-অনুরক্তের পক্ষে প্রেমাবেগ পবিত্র ধারায় সংরক্ষণ সার্বক্ষণিকভাবে সম্ভব হয় না। জাগতিক চাহিদা এবং জীবন ধারণের প্রয়োজন মানুষকে প্রায়শ পার্থিব কর্মমুখী করে দেয়। এ জন্যে প্রেমধারার পাশাপাশি আমাদেরকে কর্মজীবনের সততা এবং সুউচ্চ নৈতিকতা ধারণ করা জরুরী এতে প্রেমবাদ এবং কর্মবাদে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা সহজতর হয়। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) মাইজভাণ্ডারী দর্শনে এ পথের অনন্য সন্ধানদাতা। আমরা তাঁর খোশরোজ দিবসে বিশ্ববাসীর কল্যাণ কামনা করি।

১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় দিবস 'বিজয় দিবস'। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এদিন মুক্তি বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করায় বাংলাদেশ দখলদার মুক্ত সার্বভৌম ভূখণ্ডের গৌরব অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ ছিল জাতিগত শোষণ, বঞ্চনা, অসাম্য, নিপীড়ন, নির্যাতন এবং শ্রেণী বৈষম্যের বিরুদ্ধে মানব সাম্য, বিচার সাম্য, মানব মর্যাদা এবং ধর্ম, বর্ণ, জাতি-উপজাতি নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ভয়ঙ্কর ঔপনিবেশিক জুলুম অত্যাচার থেকে দেশ ও জাতিগত মুক্তির লড়াই। বাংলাদেশের ৪৬তম বিজয় দিবসে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়–এখনো আমরা উপর্যুক্ত অবমাননাকর কদর্য অবস্থান থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমরা এখনো জাতিগত অস্থিরতা, দলগত সংকীর্ণতা এবং বিভাজনের মাত্রা দিয়ে ১৯৭১ এর বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করি। আমাদের বিভাজন, আমাদের অনৈক্য আমাদেরকে 'আশ্রিত' অবস্থানে নিমজ্জিত করার শংকা রয়েছে। ২০১৭ এর বিজয় দিবসে মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি লক্ষ শহীদের রক্তের স্রোতধারায়, প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ভিন্ন মতের নির্বিরোধ ধারায় উদ্দীপ্ত হোক। প্রজন্ম পরম্পরা শাণিত থাকুক স্বাধীনতার প্রেরণাদ্বীপ্ত চেতনা।

তাহ্কীকুল কুরআন

সূরা আল্-বাক্বারা শরীফ (পর্ব-৮)

• অধ্যক্ষ আল্হাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী •

[বিশিষ্ট লিখক ও গবেষক অধ্যক্ষ আল্হাজ্ব মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ খান সিরাজী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক প্রণীত তাফসীর-এ-সূরা ফাতিহা শরীফ মাসিক আলোকধারায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে পর্বে পর্বে ক্রমশঃ সূরা আল বাক্বারা শরীফের তাফসীর প্রকাশ করা হচ্ছে।]

আলহাম্দু ওয়াস্সানাউ ওয়াশ্শুক্রু লিল্লাহিল্লাজী নাওয়ারানা বিনূরিল ঈমান, ওয়া আফ্দ্বালুস্সালাতু ওয়া আয্কাস্সালামু ওয়া আহ্সানুত্তাহ্ইয়াতু আলা মান খাস্সাহু বিল্ কুরআন, আল্লাজী লাইছা লাহু নজীরুন ওয়া লা মিচালুন ওয়া লা চান। ওয়া আলা আলিহী ওয়া আহ্লি বাইতিহী ওয়া আস্হাবিহিল্লাজীনা ক্বামূ বিল্ ফুরক্বান, ওয়া আলা আত্বায়ুল্লাজীনা তাবিয়ুহুম বিল্ ইহ্সান, বিল্ খসুসি আলা গাউসুল আযম আশ্শাহ আস্সূফী আস্সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ আল্মাইজভাণ্ডারী ওয়া গাউসুল আযম বিল বিরাসত বাবাভাণ্ডারী আশ্শাহ আস্সূফী আস্সৈয়দ গোলামুর রহমান, ওয়া আলা আওলাদিহীমা ওয়া আহ্লি ত্বরীক্বাতিহীমাল্লাজীনা সাবাকূনা বিল্ ঈমান। আম্মাবাদ.....

তাওহীদ ও শিরকের স্বরূপ বিশ্লেষণ: পবিত্র ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই ইসলামের চিহ্নিত শত্রুদের চেয়ে মুসলমান এর ছদ্মাবরণে মুনাফিকরাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতি করেছে ইসলামের। বর্তমানেও যুগের বিবর্তন, কাল জর্জরিত। বিভিন্ন বাতেল ফেরকা বা পথভ্রষ্ট দলউপদল গুলোর প্রচারিত ও প্রদর্শিত বাতেল আক্বীদা বা ভ্রান্ত ধর্মমতগুলো এ দেশের মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার মতো ধৃষ্ঠতাপূর্ণ দায়িত্ব পালনে এখনো বেশ কিছু কুচক্রী, দুরাচার, মানব শয়তান সচেতন ভাবে নিয়োজিত রয়েছে। এরা মুখরোচক ও শ্রুতিমধুর বিভিন্ন ইসলামী নাম ধারণ করে, কোরানী শাসন প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের ভাওতা দিয়ে, প্রকাশ্যে ইসলামের জয়গানে পঞ্চমুখ হয়ে, ধর্মের দোহাই দিয়ে, অন্তরে মুনাফেকী চেপে রেখে "মুহঁ মে শেখ ফরিদ বগলমে ইট" কিংবদন্তীর নায়ক সেজেছে। এরা মুসলমানদের পবিত্র মূলধন ঈমান আক্বীদা ও ধর্মবিশ্বাসে বিষক্রিয়া চালিয়ে, মুসলিম সংহতি ও ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে তাদের বিপথগামী করে জাহান্নামের দিকে ধাবিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তারা তাওহীদবাদী ও তৌহিদের অনুসারী বলে নিজকে জাহীর করে থাকে, অথচ তৌহিদের পরিপন্থী কাজকর্মে তারা লিপ্ত থাকতেও দ্বিধা করে না।

পবিত্র ইসলামের সঠিক দিক নির্দেশনা, একমাত্র মুক্তি পথ "আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের" বহু আক্বীদা বা ধর্মমতকে বিশেষতঃ মহাত্মা নবীগণ ও ওলীগণ সম্বন্ধে ইসলাম সম্মত বহু ধারণা ও বিশ্বাসকে লিখিত ও বাচনিক এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিরক নামে আখ্যায়িত করে থাকে; ফলে সরল ও ধর্মভীরু সুন্নী জনতা বিব্রতকর অবস্থায় পড়াটা স্বাভাবিক। তাদের এই বিভ্রান্তিমূলক ধারণার নিরসন ও অপপ্রচার রোধ করা প্রয়োজন বিধায় এ বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা দানের প্রয়াস নিলাম।

তাওহীদের আভিধানিক সংজ্ঞা: "তাওহীদ" আরবী শব্দ, যার অর্থ হলো একক, একত্ববাদ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, কোন বস্তুর একত্বের নির্দেশ করা এবং তদসম্পর্কে অবগত হওয়া, একত্ব ঘোষণা করা, মহান আল্লাহ্কে স্বকীয় ক্ষমতাসম্পন্ন মনে করা।

ব্যবহারিক সংজ্ঞা: তাওহীদ মূলত ঃ পবিত্র কলেমায়ে তাইয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গভাবে বিবৃত হয়েছে। যার অর্থ হলো ঃ সত্যিকার মাবুদ (আরাধ্য, উপাস্য, পূজনীয়) একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ নেই; অর্থাৎ মাবুদ বা ইবাদতের যোগ্য হলেন একক সত্বা আল্লাহ্ পাক জাল্লা জালালুহু। এ উক্তিকে শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারনের মাধ্যমে বাচনিক স্বীকৃতি দেয়া এবং আন্তরিকভাবে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের নামই হলো "তাওহীদ"।

তাওহীদের সংজ্ঞা প্রদান করে বিখ্যাত হাদিস বিশ্লেষক মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি কর্তৃক মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "মিরক্বাতুল মাফাতিহ্" এর ১ম খন্ড ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেনঃ "লা ইলাহা" এই নেতিবাচক বাক্যাংশ এর মধ্যে সর্বপ্রকার "ইলাহ" বা উপাস্য হওয়ার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞার অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান আর "ইল্লাল্লাহ" এই ইতিবাচক বাক্যাংশটির মধ্যে এ সত্যই বিদ্যমান যে, ওয়াজুদ বা অস্তিত্বের মধ্যে সত্যিকার মাবুদ বা উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ নেই। কেননা, পবিত্র নাম "আল্লাহ্" হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সর্বময় গুণবোধক জাত বা স্বত্তা, স্বাতন্ত্র্য বাচক, অরূপান্তরযোগ্য একটি পূণ্যময় বিশেষ্য। যিনি মাছদর বা জনকও নন; মাস্তক বা জাতকও নন।

কোন কোন মনীষীর মতে কলেমার মধ্যে "আল্লাহ্" নামের

স্থলে অন্য কোন গুণবাচক নাম যেমন "রহমান" নিলেও বিশুদ্ধভাবে মুক্ত তৌহিদ এর মর্মার্থ সাব্যস্ত হবে না। কেউ কেউ তৌহিদের পরিভাষা এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহ্‌র জাত বা স্বত্বাকে আন্তরিক বিশ্বাসের মাধ্যমে, অতঃপর বাচনিক ও কার্যতঃ ভাবে, অতঃপর দৃঢ় প্রত্যয় ও পরিচিতির সাথে, অতঃপর প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে, অতঃপর প্রামাণ্য ও চিরস্থায়ীভাবে তাঁর (এক) একত্বের সাথে কোনরূপ সাদৃশ্যতা হতে পবিত্র বলে প্রমাণ করা।

তৌহিদের মর্মবাণী: মনে প্রাণে, কল্পনায়-ধারণায়, কথায়-কাজে, যে কোন স্থান কাল ও অবস্থায় অদ্বিতীয় জাত বা স্বত্বা মহান আল্লাহর সাথে কোনরূপ শরীক বা অংশীদার সাব্যস্ত না করাই হলো তৌহিদের মর্মবাণী।

"শির্‌ক" এর আভিধানিক সংজ্ঞা: শির্‌ক আরবী শব্দ, অর্থ- অংশীবাদ, অংশীদারীত্ব, অংশ সাব্যস্ত করা, আল্লাহ্‌র সাথে অন্য জনকে তুলনা করা।

শির্‌ক এর ব্যবহারিক সংজ্ঞা: শির্‌ক হলো এমন সব বস্তু যে গুলোকে স্বয়ং কলেমাএ তাইয়েবা নিজেই বাতিল বা অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যকাউকে মাবুদ বা উপাস্য সাব্যস্ত করাকে অগ্রাহ্য করেছে। যেমন, "তাফ্‌সীরে খাজেন" ১ম খন্ড ২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে "মাই ইউশ্‌রিক বিল্লাহি ইয়ানি ইয়াজয়ালু মায়াহু শরীকান গায়রাহু"। অর্থাৎ আল্লাহর সাথে শরীক করার অর্থ হলো, তিনি ভিন্ন অপরকে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।" আকাইদ বা ধর্মমত সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ কিতাব "শরহে আকাইদ" এর ১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে "আল ইশ্‌রাকু হুয়া ইছ্‌বাতুশ শরীকে ফিল উলুহিয়্যাতে.....।" অর্থাৎ শির্‌ক হলো, অংশীদার সম্পন্ন উপাস্য প্রমাণিত করা। যেমনঃ মজুছী বা অগ্নী পূজকরা "ওয়াজিবুল ওয়াজুদ" বা আবশ্যকীয় অস্তিত্ব রূপে আগুনকে উপাস্য মনে করে থাকে। অথবা মূর্তী পূজারীরা ইবাদত বা উপাসনার যোগ্য মনে করে বিভিন্ন দেব দেবী ও প্রতিমা পূজা করে থাকে। এ সবই হলো শিরিক। অনুরূপ বর্ণনা বিখ্যাত মুসলিম মনীষী মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি কৃত "শর্‌হে ফিক্‌হে আকবর" গ্রন্থেও বিধৃত রয়েছে।

শিরকের প্রকারভেদ: এ উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয়, বিশ্ব বিশ্রুত হাদিস গুরু মহাত্মা শেখ শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী রহমাতুল্লাহি তা'য়ালা আলাইহি কৃত মিশ্‌কাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "আশ্‌আতুল্ লুম্‌আত" এর ১ম খন্ড ৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন "বিল্ জুম্‌লা শির্‌ক ছে কিছিম আছ্‌ত, দর ওয়াজুদ ওয়া দর খালেকীয়ত ওয়া দর ইবাদত।" ভাব সম্প্রসারিত অর্থ- মোটের উপর শির্‌ক তিন প্রকারে সংঘটিত হয়ে থাকে (এক) আল্লাহ্ ভিন্ন দ্বিতীয় কাউকে ওয়াজেবুল ওয়াজুদ বা অপরিহার্য অস্তিত্বসম্পন্ন সাব্যস্ত করা। (দুই) আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কাউকে মূল সৃষ্টিকর্তা বলে ধারণা করা অথবা মুখে বলা। (তিন) আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত করা অথবা কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত ধারণা করা।

অন্যভাবে শির্‌ককে দু'ভাগে ভাগ করা হয় ১। জলী, ২ খফী। সাধারণত আল্লাহ্ ভিন্ন অপর কিছুর ইবাদত বা উপাসনা সরাসরিভাবে করাটাই হলো শির্‌কে জলী বা স্পষ্ট শির্‌ক; যা অমুসলিমদের মধ্যে বিদ্যমান; তাদের ধর্ম কর্মের অন্তর্ভূক্ত এবং প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা আর অন্তরে লোক দেখানো বা শোনানোর নিয়ত বা উদ্দেশ্য রাখাই হলো শিরকে খফী বা প্রচ্ছন্ন শিরক্। যা মুসলমানদের ধর্ম কাজেও বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা থাকে; যেটাকে ফার্সী ভাষায় বলা হয় "রীয়াকারী"। এ ধরনের শির্‌কের ব্যাপারেও ইসলাম ধর্মে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

শির্‌ক নিরূপন: কোন পর্যায়ে কোন ধরনের আক্বীদা বা ধর্মমত শিরিক সাব্যস্ত হয় এবং বিশ্বাসকারী মুশরিক হয়ে যায় সে সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা প্রদান করা এ অনুচ্ছেদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। "ওয়াজিবুল ওয়াজুদ" বা অপরিহার্য অস্তিত্ব সম্পন্ন এবং নিজের জাত ও কামালাত কিংবা স্বকীয়তা ও পরিপূর্ণতার মধ্যে অপর কারো মুখাপেক্ষীহীন, স্বত্বাগত স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালা। এ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। কেউ যদি দ্বিতীয় কাউকে তার স্বত্বা পরিপূর্ণতার মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র বলে বিশ্বাস করে অথবা ইবাদতের উপযোগী বলে সাব্যস্ত করে তা হলে সে হবে মুশরিক বা অংশীবাদী।

আল্লাহ্ ভিন্ন অপরকে মুখাপেক্ষীহীনভাবে "কাদীম" বা আদি, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর মনে করাটাও শিরিক। যেমন- "আরীয়া" সম্প্রদায়ের লোকেরা আল্লাহ্ ব্যতীত আত্মা এবং বস্তুর মূল উৎসকেও স্রষ্টার মুখাপেক্ষীহীনভাবে কাদীম এবং ওয়াজেবুল ওয়াজুদ সম্পন্ন মৌলিক স্বত্বা মনে করে থাকে- তারাও মুশরিক। এমনিভাবে কারো কামালিয়াত বা পূর্ণতা, বুজুর্গী ও সাধুতা কিংবা আধ্যাত্মিকতাকে যদি কেউ স্রষ্টার মুখাপেক্ষিহীন ভাবে নিজস্ব স্বত্বাগত মনে করে তাহলে সেও মুশরিক পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ পাক ব্যতীত দ্বিতীয় কারো জন্য একটা অনু পরমানুর উপরও ক্ষমতা, আয়ত্ব, জ্ঞান, অধিকার ইত্যাদি যদি স্বত্বাগত ও স্বকীয়তা সহকারে সাব্যস্থ ও প্রমাণিত করা হয় তাও হবে শির্‌ক।

এমনিভাবে স্রষ্টার মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জ্ঞান, বুদ্ধি, শক্তি, ক্ষমতা, জীবন অমরত্ব, দৃষ্টি, শ্রবণ শক্তি ইত্যাদি কামালিয়াত বা পূর্ণতাকে স্বকীয়, স্বাতন্ত্র্য, নিজস্ব ও আদি মনে করলে তাও শির্‌ক হবে; ধারণাকারী

মুশ্‌রিক হয়ে যাবে; যেমন নক্ষত্র পূজারীদের ধারণা। এরা গ্রহ-নক্ষত্রকে স্বকীয় শক্তিসম্পন্ন মনে করে। কারো মুখাপেক্ষীহীনভাবে ঐসব সৌর শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর কার্য নির্বাহ হচ্ছে বলে বিশ্বাস করে। কাফের বা খোদা দ্রোহীরা প্রভাবজাত ক্ষমতাগুলোকে বস্তু বা পদার্থের জন্য নির্দিষ্ট করে থাকে। ঐসবকে স্বকীয় ক্ষমতাধর ও স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বত্বা বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। এরা বস্তুবাদী মুশরিক।

শির্‌ক মুক্ত বিশ্বাস: মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হলেন ক্বাদেরে মত্‌লক্ব বা মুক্ত শক্তি সম্পন্ন, স্বকীয় ক্ষমতাধর ও অসীম কুদরতের অধিকারী। উল্লেখিত বস্তু ও পদার্থের প্রভাবের অন্তরালে রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র কুদরতী অকল্পনীয় হস্ত মুবারকের ইঙ্গিত। ওগুলোর চালিকা, জীবনী ও প্রভাব শক্তি আল্লাহ্‌র দানীয় শক্তি বলে বিশ্বাস রাখা এবং ওসবকে উসিলা, মাধ্যম ও অবলম্বন মনে করা কখনো শিরিক নয়। কেননা গ্রহ-নক্ষত্র, জীব-জন্তু, মানব-দানব তথা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে নিজস্ব কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই। ওগুলোর শক্তি দৃশ্যতঃ নিজস্ব বলে মনে হলেও বস্তুতঃ সৃষ্টি জগতের যাবতীয় শক্তি, ক্ষমতা, প্রভাব ও গুণাগুণ সব একমাত্র আল্লাহ্‌রই প্রদত্ত। তাঁরই আজ্ঞাবহ। সে দৃষ্টিভঙ্গীতে সৃষ্টির ক্ষমতাগুলো পরোক্ষাভাবে আল্লাহরই ক্ষমতা এবং সর্বপ্রকারের শক্তি ও ক্ষমতার উৎস হলেন একমাত্র স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। তিনি যাঁকে ইচ্ছে তার শক্তি দান করে থাকেন। আর তাঁরই দান প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টি ক্ষমতাবান হন। এ ধরনের আক্বীদা বা ধর্মবিশ্বাস কোন শিরিক নয়- ধারণাকারীও মুশরিক নয়।

এ প্রসংগে মহাত্মা শাহ্ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিছ দেহলবী বিরচিত "তাফসীরে আজীজী" এর ৪৬০ পৃষ্ঠায় সূরা বাক্বারার তাফ্‌সীরে বর্ণনা করেন- "আল্লাহ্ তা'য়ালার স্বভাবগত কর্ম যেমন, সন্তান দান করা, রিজিক বা অনুদান প্রসার করা, রুগ্ন ব্যক্তিকে নিরাময় করা প্রভৃতি ক্রিয়া ও কর্মকান্ডকে মুশ্‌রিক ও অংশীবাদীরা পাপাত্মাসমূহ, প্রতিমা-মূর্তি, দেব-দেবী প্রভৃতির দিকে সম্পর্ক যুক্ত করে থাকে, তাদের স্বকীয় ক্ষমতার প্রতিফলন বলে বিশ্বাস করে এবং তাতে তারা কাফের ও খোদাদ্রোহী হয়ে যায়। পক্ষান্তরে তৌহিদবাদীরা ঐসব কাজ, কর্মকান্ডকে আল্লাহ্‌র (মৌলিক ও গুণবাচক) পবিত্র নাম সমূহের বরকত ও প্রভাব জনিত কাজ কিংবা সৃষ্টির স্বভাবসিদ্ধ, প্রকৃতিগত, Natural ও গুণগত বৈশিষ্ট্য (যা আল্লাহ্ প্রদত্ত) কিংবা আল্লাহ্‌র নেক ও পবিত্র বান্দা মহা মানব (যেমন, নবী, ওলী, গাউস, কুতুব, ফিরিস্তা, আহলুল্লাহ) দের দোয়ার প্রভাব জনিত কাজ বলে বিশ্বাস রাখে; যা আম্বীয়া ও আওলিয়ায়ে কিরাম আল্লাহ্‌র দরবারে আবেদন নিবেদন করে সৃষ্টির হাযত রওয়াই বা উদ্দেশ্য সফল, মনোবাসনা পূরণ, ও সমস্যাদির সমাধান করিয়ে দেন। এ ধরনের ধারণা ও বিশ্বাসের ফলে ঈমান আক্বীদায় কোনরূপ ক্ষতি হয় না। ধর্মবিশ্বাসে কোন রূপ ত্রুটি বিচ্যুতি হয় না।"

সর্বপ্রকার ক্ষমতার ব্যাপারে সৃষ্টি সর্বদা আল্লাহ্‌র করুণার মুখাপেক্ষী। তিনি দয়া না করলে তিল পরিমান শক্তি প্রদর্শন করা কোন সৃষ্টির পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস স্থাপনকারী সততই তওহীদবাদী। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় ও পবিত্র বান্দাদের কামালিয়াতপূর্ণতা ও ক্ষমতারাজী মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বলে প্রমাণিত করে এবং তা কখনো নিজস্ব নয় বলে বিশ্বাস রাখে সেও তৌহিদবাদী। ***(চলবে)***

সুফি উদ্ধৃতি

- কুস্বভাবাপন্ন আলিম অপেক্ষা সুস্বভাবাপন্ন ফাসিকের সাহচর্য উত্তম।
- আল্লাহ্‌র নিয়ামত ও স্বীয় অপরাধের কথা চিন্তা করলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তা-ই লজ্জা।
- স্বীয় ইখতিয়ারকে দূর করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নিজেকে সোপর্দ করার নাম রোজা।
- তাওবার অবস্থা তিনটি। যথাঃ (১) আল্লাহ্‌র নিকট লজ্জিত হওয়া, (২) পাপ কাজ বর্জন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করা, আর (৩) জুলুম ও ঝগড়া থেকে নিজেকে পাক রাখা।
- সত্যবাদীর নাম হল সততা। যে ব্যক্তিকে কথায়, কাজে সৎ দেখা যায়, সে-ই সিদ্দীক।

–হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

প্রসঙ্গ ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপন

উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ থেকে

পবিত্র ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (দঃ) উদ্‌যাপনের ইতিহাস অতি প্রাচীন। মিলাদুন্নবীর সুচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। রোজে আজলে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামকে নিয়ে আল্লাহ্ এই মিলাদের আয়োজন করেছিলেন। নবীগণের মহাসম্মেলন ডেকে মিলাদুন্নবী আয়োজক স্বয়ং আল্লাহ্ নিজে ছিলেন মীরে মাজলিস বা সভাপতি। সকল নবীগণ ছিলেন শ্রোতা। ঐ মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত, শান ও মান অন্যান্য নবীগণের সামনে তুলে ধরা এবং তাঁদের থেকে তাঁর উপর ঈমান আনয়ন ও সাহায্য সমর্থনের প্রতিশ্রুতি আদায় করা।

কুরআন মজিদের ৩য় পারা সূরা আলে এমরানে ৮১-৮২ নং আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা ঐ মিলাদুন্নবী মাহফিলের কথা উল্লেখ করেছেন। নবীজীর সম্মানে এটাই ছিল প্রথম মিলাদ মাহফিল এবং মিলাদ মাহফিলের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা। সুতরাং মিলাদ মাহফিল আনুষ্ঠান হচ্ছে আল্লাহ্‌র সুন্নত বা ত্বরিকা। ঐ মজলিসে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামও উপস্থিত ছিলেন। ঐ মজলিসে স্বয়ং আল্লাহ্ নবীজীর শুধু আবির্ভাব বা মিলাদের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সিরাতুন্নবীর উপর কোন আলোচনা সে দিন হয়নি। সমস্ত নবীগণ খোদার দরবারে দণ্ডায়মান থেকে মিলাদ শুনেছেন এবং কিয়াম করেছেন। কেননা খোদার দরবারে বসার কোন অবকাশ নেই, পরিবেশটি ছিল আদবের। মিলাদ পাঠকারী ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ এবং কিয়াম কারীগন ছিলেন আমবিয়ায়ে কিরাম। এই মিলাদ ও কিয়াম কুরআনের "ইকতেদো উন নস" দ্বারা প্রমাণিত হলো: উল্লেখ্য যে কুরআনে মজিদের "নস" চার প্রকার যথা: ১/ইবারত, ২/দালালত, ৩/ ইশারা ও ৪/ইক্কতিজা। উক্ত চার প্রকার দ্বারাই দলিল সাবেত হয়। (নুরুল আনওয়ার দেখুন) নিম্নে উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে ইবারতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে অঙ্গীকার/দালালাতের দ্বারা নবীগণের মাহফিল, ইশারার দ্বারা মিলাদের বা আবির্ভাবের এবং ইকতিজার দ্বারা কিয়াম প্রমাণিত হয়েছে। সুতরং মিলাদুন্নবী মহফিল কিয়াম নবীগণের সম্মিলিত সুন্নাত ও ইজামায়ে আম্বিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

কুরআন মজিদে আলে এমরানের আয়াত ৮১-৮২ উল্লেখ করা হলো : আল্লাহ্ বলেন (৮১) "হে প্রিয় রাসূল! আপনি স্মরণ করুন ঐ দিনের কথা, যখন আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত নবীগণ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এ কথার উপর যে, যখন আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করবো; তারপর তোমাদের কাছে আমার মহান রাসূল যাবেন এবং তোমাদের নবুয়্যাত ও কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করবেন, তখন তোমরা অবশ্য অবশ্যই তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবে" আল্লাহ্ বলেন : "তোমরা কি এ সব কথার উপর অঙ্গীকার করছো এবং এই শর্তে আমার ওয়াদা গ্রহন করে নিয়েছো (তখন) তাঁরা সকলেই সমস্বরে বলেছিলেন, আমরা অঙ্গিকার করছি।"

আল্লাহ্ বলেন: "তাহলে তোমরা পরস্পর সাক্ষি থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে মহাসাক্ষী রইলাম"। (৮২) "অত:পর যে কোন লোক এই অঙ্গীকার থেকে ফিরে যাবে- সেই নফরমান" (কাফের)। উক্ত দুটি আয়াতের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে ১০ টি বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যথা: ১। এই ঐতিহাসিক মিলাদ সম্মেলনের ঘটনাবলীর প্রতি রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দৃষ্টি আকর্ষণ। যেহেতু নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ সময়ে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ২। আল্লাহ্ কর্তৃক অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট থেকে নবীজীর শানে অঙ্গীকার আদায়। ৩। নবীগণের রমরমা রাজত্বকালে এই মহান নবীর আগমন হলে তাঁর উপর ঈমান আনতে হবে। ৪। তাঁর আগমন হবে অন্যান্য নবীগণের সত্যতর দলীল স্বরূপ। ৫। ঐ সময়ে নবীগণের নবুয়ত স্থগিত রেখে-নবীজীর উপর ঈমান আনয়ন করতে হবে। ৬। নবীজীকে সর্বাবস্থায় পূর্ণ সাহায্য সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার আদায়। জীবনের বিনিময়ে এই সাহায্য হতে হবে নি:শর্তভাবে। ৭। নবীগণের স্বীকৃতি প্রদান। ৮। পরস্পর সাক্ষী হওয়া। ৯। সকলের উপরে আল্লাহ্ মহাসাক্ষী। ১০। ওয়াদা ভঙ্গের পরিনাম - নাফরমান ও কাফের। ১১. নং দফায় নবীগণের উম্মত তথা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা নবীগণের অস্বীকারের প্রশ্নই উঠে না। অস্বীকার করেছেন ইয়াহুদী ও নাসারাগণ। সুতরাং তারাই কাফের"। বর্তমানে আমাদের সমাজে রাসূল (সাঃ) বিদ্বেষী একদল মুনাফেক মুসলমানের আবির্ভাব ঘটেছে। কুরআন হাদিসের জ্ঞান শূন্য মুর্খ থেকে শুরু করে লেবাসধারী আলেম উলামা পীর মাসায়েখরা পর্যন্ত বলে এবং বেদাতের ফতোয়াবাজি করে যে, মহাপবিত্র ঈদুল আজম "ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম" নাকি কুরআন হাদিসে নাই? **মুর্খ মুনাফেকদের** এই মিথ্যাচারের দাতভাঙ্গা জবাব হিসেবে পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফ থেকেই পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলিল আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন- 'তোমাদেরকে যে নিয়ামত দেওয়া হয়েছে তার জিকির কর এবং খুশি উদযাপন কর'। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফের সূরা ইউনুসের ৫৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন- 'হে রাসূল আপনি বলুন আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমতকে কেন্দ্র করে তারা যেন আনন্দ করে এবং এটা হবে তাদের অর্জিত সকল কর্মফলের চেয়েও অধিক শ্রেষ্ঠ'। এ পৃথিবীতে যত নেয়ামত

রয়েছে বা এসেছে এর চেয়ে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছেন হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্‌র এই নেয়ামত ও অনুগ্রহকে কেন্দ্র করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও আনন্দ উদ্‌যাপন করার নির্দেশ স্বয়ং রাব্বুল আলামীন দিয়েছেন যার প্রমাণ উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত। অতএব নবীজির শুভাগমনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি হতে পারে?

আবার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ১০৭নং আয়াতে দয়াল নবীজির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য ঘোষণা করেন, 'নিশ্চয় আমি আপনাকে জগতসমূহের রহমত করেই প্রেরণ করেছি।' আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের ১১৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন 'ঈসা ইবনে মারিয়াম (আঃ) দুয়া করলেন, হে আল্লাহ্! হে আমাদের প্রভু আমাদের প্রতি আকাশ হতে খাদ্য অবতীর্ণ করুন যেন সেটা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা প্রথমে (বর্তমানে আছে) এবং যারা পরে, সকলের জন্য আনন্দের বিষয় হয় এবং আপনার পক্ষ হতে এক নিদর্শন হয় (ঈদের দিন)। আর আপনি আমাদেরকে রিজিক প্রদান করুন বস্তুত আপনিই সর্বোত্তম রিজিক প্রদানকারী।' মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে খাদ্য ভর্তি ... পেলে তা যদি ঈসা (আঃ) এর ভাষায় সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত আনন্দ উৎসবের কারণ হয় তবে রাহমাতুল্লিল আলামিন নবীজির মত মহান নেয়ামতের শুভাগমনের দিনটি কতই না গুরুত্বপূর্ণ, মর্যাদাপূর্ণ ও আনন্দের তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাছাড়া সূরা আজহাবের ৫৬নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন, "তোমরা আমার হাবিবের প্রতি দুরুদ সালাম প্রেরণ কর"। অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদেরকে স্পষ্ট এখানে নির্দেশ করেছেন উনার হাবিবের প্রতি দুরুদ সালাম জানানোর জন্য। আল্লাহ্‌র নির্দেশ বিবেচনায় যা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য ফরজ (অর্থাৎ নবীজিকে তাজিম করা, সম্মান করা, নবীজিকে দিয়ে ভালো মনোভাব পোষণ করা)। এখন যারা মিলাদুন্নবীর বিপক্ষে কথা বলে, পাইকারী ফতোয়াবাজি করে এবং কুররআনে নেই বলে মিথ্যা অপপ্রচার চালায় তারা মূলত পবিত্র কুরআনকে অস্বীকার করার মাধ্যমে যে কাফেরে পরিণত হয়ে যাচ্ছে সেই খবর কি ওদের আছে? অতএব পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফের উক্ত আয়াতগুলো থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ হয়ে যায় ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি মনে পালন করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের জন্য ঈমানী দায়িত্ব এবং এই দিনের চেয়ে নিয়ামতপূর্ণ দিন আর হতেই পারেনা!

ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে শত শত সহি হাদিস শরিফ থেকে কিছু হাদিস আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি। রাহমাতুল্লিল আলামিন হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই নিজের মিলাদ পালন করেছেন। এই প্রসঙ্গে পবিত্র হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একজন সাহাবী হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ আমার মাতা পিতা আপনার নূরের পাক কদমে কুরবান হোক। আপনি প্রতি সোমবার রোজা পালন করেন কেন? জবাবে সরকারে দুজাহান নূরে মুজাস্সাম হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই দিনে আমার জন্ম হয়েছে, এই দিনে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং পবিত্র কালামুল্লাহ শরিফ এই দিনেই আমার উপর নাজিল হয়েছে। (সহীহ মুসলিম শরিফ ২য় খন্ড, ৮১৯ পৃষ্ঠা, বায়হাকী: আহসানুল কুবরা, ৪র্থ খন্ড ২৮৬ পৃ: মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল ৫ম খন্ড ২৯৭ পৃ: মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৪র্থ খন্ড ২৯৬পৃ: হিলিয়াতুল আউলিয়া ৯ম খন্ড ৫২ পৃ:) বুখারী শরিফের বিখ্যাত ব্যাখ্যাকারী আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম বদরুদ্দিন আইনি বুখারী শরিফের ব্যাখ্যায় লিখেন 'হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আবু লাহাবের মৃত্যুর এক বছর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখি। সে আমাকে বলে ভাই আব্বাস আমার মৃত্যুর পর থেকে কবরের জিন্দেগীতে আমি শান্তিতে নেই। কিন্তু প্রতি সোমবার এলেই আমার শাস্তি লাঘব করে দেওয়া হয়। এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন আবু লাহাবের এই সোমবারের শাস্তি লাঘবের কারণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত শরিফ উপলক্ষে হুজুর যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন নবীজির শুভাগমনে খুশি হয়ে হযরত সুয়াইবাকে (রাঃ) আজাদ করে ছিলেন। (ফাতহুল বারি সরহে সহীহুল বুখারী, অমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহুল বুখারী)। এখন কথা হলো আবু লাহাবের মত কাট্টা কাফের যদি নবীজির একদিনের বেলাদত শরীফে খুশি হয়ে প্রতি সপ্তাহে প্রতি সোমবার তার জাহান্নামের আজাব লাঘব হয়ে যায়, আমরা যারা মুমিন মুসলমান তারা জীবনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতগুলো বিলাদত শরিফ খুশি মনে পালন করে তার বিনিময়ে কি জান্নাত পেতে পারিনা? এই প্রসঙ্গে উপমহাদেশের প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ অলিয়ে কামেল শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ) বলেন, যারা হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত শরিফকে সম্মান ও তাজিম করবে এবং খুশি মনে পালন করবে সে চির শান্তির জায়গা জান্নাতের অধিকারী হবে। (মাছাবাতা বিস সুন্নাহ ১ম খন্ড, খুত্বায়ে ইবনে নাবাতা)।

অতএব হাদিস শরিফ থেকে মহা পবিত্র ঈদ উল আজম ঈদ ই মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈধতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো, এরপরও যদি কেউ পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপক্ষে কথা বলে, বেদাতের ফতোয়া দেয় বুঝতে হবে সে হয়তো অন্ধ, মুর্খ নতুবা মুনাফেক, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের জাত শত্রু। কেননা অন্ধ আর মূর্খর পক্ষে হাদিস পড়া সম্ভব না আর মুনাফেক ছাড়া কেউ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান মান তথাপি উনার পবিত্র জন্মদিনকে অস্বীকার করতে পারেনা! হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ুতী রাহিমামুল্লাহ আলাইহি যার সনদ সহ প্রায় ২ লক্ষ হাদিস শরিফ মুখস্থ ছিল সেই তাজুল মুফাস্সিরীন মোহাদ্দেস মুসান্নিফ সুয়ুতি রাহিমামুল্লাহ আলাইহি তিনি উনার বিখ্যাত কিতাব 'সুবলুল হুদা ফি মাওলেদে মুস্তাফা আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এ দুই খানা সহি হাদিস শরিফ বর্ণনা করেছেন। পবিত্র হাদিস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- হযরত আবু দ্বারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হযরত আমির আনসারী (রাঃ) এর গৃহে গেলেন এবং হুজুর দেখতে পেলেন আমির আনসারী (রাঃ) উনার পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একত্রিত হয়ে খুশি মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত শরিফ পাঠ করছেন। অর্থাৎ নবীজি এইদিনে পৃথিবীতে এসেছেন, পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মাখলুক আনন্দিত হয়ে ইত্যাদি। এই ঘটনা শ্রবণ করে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে হযরত আমির আনসারীকে বললেন, আল্লাহ্ পাক আপনার জন্য উনার রহমতের দরজা প্রশস্থ করেছেন এবং সমস্থ ফেরেশ্তাগণ আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। যে আপনার জন্য এইরূপ কাজ করবে সেও আপনার মত নাজাত (ফজিলত) লাভ করবে, (সুবহান আল্লাহ্) পবিত্র হাদিস শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, একদা তিনি উনার গৃহে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে একত্রিত হয়ে হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত শরিফ পাঠ করছিলেন। (এই দিনে হুজুর পৃথিবীতে আসছেন, স্বয়ং আল্লাহ্ উনার হাবিবের উপর দুরুদ সালাম দিয়েছেন) শ্রবণকারীরাও তা শুনে আনন্দ পাচ্ছিলেন। ঠিক ওই সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এই হাদিসটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এসেছে যেমন: মাওলুদুল কবীর, আত তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযার, হকিকতে মোহাম্মদী (মিলাদ অধ্যায়), দুররুল মুনাজ্জাম, ইশবাউল কালাম। অতএব উপরোক্ত সহি হাদিসের মাধ্যমে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈধতা প্রমাণিত হলো, এরপরও যদি কেউ পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপক্ষে কথা বলে, বেদাতের ফতোয়া দেয় বুঝতে হবে সে হয়তো অন্ধ, মুর্খ নতুবা মুনাফেক রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জাত শত্রু। কেননা অন্ধ আর মূর্খর পক্ষে হাদিস পড়া সম্ভব না আর মুনাফেক ছাড়া কেউ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শান মান তথাপি উনার পবিত্র জন্মদিনকে অস্বীকার করতে পারেনা! প্রমাণ নং-০৩ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মিলাদ নিজেই পাঠ করেছেন। একদিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারে দাঁড়িয়ে সমবেত সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে বললেন : তোমরা বল - আমি কে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন আপনি আল্লাহ্র রাসূল। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ, আব্দুল মোত্তালিবের নাতী, হাশেমের প্রপৌত্র এবং মানাফের পুত্রের প্রপৌত্র। এই হাদিসের গুরুত্ব মতেই ইমামগণ চার কুরছিকে ফরজ বলেছেন। হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেন: আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ হতে আমার একটি বিশেষ মর্যাদা এই যে, "আমি খতনা অবস্থায় ভুমিষ্ঠ হয়েছি এবং আমার লজ্জাস্থান কেউ দেখেনি"। [তাবরানী, জুরকানী] অন্যান্য রেওয়ায়াতে পবিত্র, নাভি কর্টকৃত, সুরমা পরিহিত, বেহেস্তি লেবাস পরিহিত অবস্থায় ভুমিষ্ঠ হওয়ার বর্ণনা এসেছে । [মাদারেঝুন্নবুয়াত] এছাড়াও জঙ্গে হোনায়নের যুদ্ধে যখন হাওয়াজিনের তীর নিক্ষেপে মুসলিম সৈন্যগন ছত্রভঙ্গ হয়ে পরেছিলেন , তখনও হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একা যুদ্ধ ময়দানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন " আনা নাবিয়ু লা কাযেব + আনা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব " অর্থাৎ আমি আল্লাহ্র নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আব্দুল মোত্তালিবের বংশধর । উপরোক্ত প্রথম ঘটনা টি দাঁড়িয়ে বলা এবং বর্ণনা করার নামই মিলাদ ও কিয়াম। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম স্বয়ং রাসূল পাকের সুন্নত। দ্বিতীয় বর্ণনায়" ওয়ালাদাত" শব্দটি এসেছে। এর অর্থ হলো আমি জন্ম গ্রহণ করেছি ভুমিষ্ঠ হয়েছি -আবির্ভুত হয়েছি। সব বর্ণনাই নবী করীম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়াম অবস্থায় ছিলেন। তিনি নিজেই কিয়াম করেছেন সুতরাং বেলাদতের বর্ণনাকালে কিয়াম করা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই সুন্নত। সাহাবা যুগে মিলাদুন্নবী মাহফিলের প্রমাণ: হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরাম মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান করেছেন। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ:

১। হযরত আবু দারদা রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু হতে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি নবী করিম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদিনার আবু আমের আনসারির গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজনকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন আজই সেই দিন। ইহা দেখে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র ফেরেশ্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন। [দুররে মুনাজ্জাম আব্দুল হক এলাহাবাদি] ২। ইবনে আব্বাস রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে একদিন

তিনি (ইবনে আব্বাস) কিছু লোক নিয়ে নিজগৃহে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনা সহ দুরুদ ও সালাম পেশ করেছিলেন। এমন সময় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেন: তোমাদের সকলের জন্য আমার সাফায়াত অবধারিত হয়ে গেল"। [ইবনে দাহইয়ার আত-তানভির ৬০৪ হিজরি] সুতরাং প্রমাণীত হলো যে নবী পাকের মিলাদ শরিফ পাঠে রাসূলে পাকের সাফায়াত নসীব হবে। ৩। হযরত হাসসান বিন সাবিত রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু মিম্বারে দাঁড়িয়ে কবিতার মাধ্যমে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেছেন, দীর্ঘ কবিতার একাংশ উদ্ধৃত করা হলো; ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি সর্ব দোষক্রটি হতে মুক্ত হয়েই জন্মগ্রহণ করেছেন। আপনার এই বর্তমান সুরত মনে হয় আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবীর নাম আযানে নিজের নামের সাথে সংযুক্ত করেছেন। এর প্রমাণ যখন মুয়াজ্জিন পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ "বলে আযান দেয়। আল্লাহ্ তায়ালা আপন নামের অংশ দিয়ে নবীজীর নাম রেখেছেন-তাঁকে অধিক মর্যাদাশীল করার লক্ষ্যে। এর প্রমাণ হচ্ছে আরশের অধিপতির নাম হচ্ছে "মাহমুদ" এবং আপনার নাম হলো "মুহাম্মদ"। [দিওয়ানে হাসসান] (বিঃ দ্রঃ) আরবীতে মাহমুদ লিখতে পাঁচ হরফ যেমন মিম-হা-মিম-ওয়াও-দাল এবং মুহাম্মদ লিখতে যেমন মিম-হা-মিম-দাল ব্যবহৃত হয়। ব্যবধান মাত্র এক হরফের বিষয়টি খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। মাত্র ওয়াও হরফের ব্যবধান। উক্ত মিলাদী কাসিদায় হযরত হাসসানের কয়েকটি আকিদা প্রমাণিত হয়েছে যেমন:

১। রাসূল (সা) এর উপস্থিতিতে এই প্রশংসাসুচক কাসিদা পাঠ। ২। মিম্বারে দাঁড়িয়ে (কিয়াম) অবস্থায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবৃত্তান্ত ও গুণাবলী বর্ণনা করা। ৩। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্ব প্রকার ক্রটি হতে মুক্ত। ৪। আযানের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে আল্লাহ্র নামের পাশে নবীজীর নামে আল্লাহ্ কর্তৃক সংযোজন। ৫। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ নামের উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র সিফতী নাম মাহমুদ। হযরত হাসসান বিন সাবিত রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু এর কণ্ঠে মিলাদ পাঠ শুনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন" আল্লাহুম্মা আইয়িদ বি রূহিল কুদ্দুস "অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! তুমি তাকে জিবরাঈল মারফত সাহায্য করো" তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান এ উল্লেখ আছে যারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রশংসাগীতি করে, তাদের উপরে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর গায়েবী মদদ থাকে [সূরা মূজাদালাহ] প্রমাণ নং-০৪ নবীগণের যুগে মিলাদুন্নবী: ১। হযরত আদম আলাইহিস সালাম এর যুগে মিলাদ প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে আমাদের প্রিয়নবী ও আল্লাহ্র প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। হযরত আদম আলাইহিস সালাম তাঁর প্রিয় পুত্র ও প্রতিনিধি হযরত শীস আলাইহিস সালাম কে নুরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাজিম করার জন্য নিজে অসিয়ত করে গেছেন। অনুবাদ অংশটি বর্ণনা করা হলোঃ "আদম আলাইহিস সালাম আপন পুত্র হযরত শীস আলাইহিস সালাম কে লক্ষ্য করে বললেন : হে প্রিয় বৎস, আমার পরে তুমি আমার খলিফা। সুতরাং এই খেলাফত কে তাকওয়ার তাজ ও দৃঢ় একিনের দ্বারা মজবুত করে ধরে রেখো। আর যখনই আল্লাহ্র নাম জিকির (উল্লেখ) করবে তাঁর সাথেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামও উল্লেখ করবে। তার কারণ এই: আমি রূহ ও মাটির মধ্যবর্তী থাকা অবস্থায়ই তাঁর পবিত্র নাম আরশের পায়ায় (আল্লাহ্র নামের সাথে) লিখিত দেখেছি। এরপর আমি সমস্ত আকাশ ভ্রমন করেছি। আকাশের এমন কোন স্থান ছিলনা যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম অঙ্কিত পাইনি। আমার রব আমাকে বেহেশ্তে বসবাস করতে দিলেন। বেহেশ্তের এমন কোন প্রাসাদ ও কামরা পাইনাই যেখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম ছিলনা। আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম আরোও লিখিত দেখেছি সমস্ত হুরদের স্কন্ধ দেশে, বেহেশ্তের সমস্ত বৃক্ষের পাতায়, বিশেষ করে তুলা বৃক্ষের পাতায় পাতায়, পর্দার কিনারায় এবং ফেরেশ্তাগণের চোখের মনিতে ঐ নাম অঙ্কিত দেখেছি। সুতরাং হে শীস! তুমি এই নাম বেশী বেশী করে জপতে থাক। কেননা, ফেরেশ্তাগণ পুর্ব হতেই এই নাম জপনে মশগুল রয়েছেন" [জুরকানি শরিফ]। উল্লেখ্য যে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে এটিই ছিল জিক্রে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এর মিলাদ পাঠ ও কিয়াম: হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এবং হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহ্র ঘর তৈরী করছিলেন, তখন ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম উক্ত ঘরের নির্মাণ কাজ কবুল করার জন্য নিজের ভবিষ্যৎ সন্তানাদিদের মুসলমান হয়ে থাকার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ করার পর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বা কিয়াম করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব আরবে ও হযরত ইসমাইলের বংশে হওয়ার জন্য এভাবে দোয়া করেছেন। অর্থাৎ হে আমার রব! তুমি এই আরব ভুমিতে আমার ইসমাইলের বংশের মধ্যে তাদের মধ্যে হতেই সেই মহান রাসূলকে প্রেরণ করো- যিনি তোমার আয়াত সমুহ তাদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কুরআন সুন্নাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। [সূরাহ আল বাকারা ১২৯ আয়াত] এখানে দেখা যায় হযরত

ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ৪০০০ বৎসর পুর্বেই মুনাজাত আকারে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর সারা জিন্দেগীর কর্ম চাঞ্চল্য ও মানুষের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষমতা বর্ণনা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর মিলাদের সারাংশ পাঠ করেছেন এবং এই মুনাজাত বা মিলাদ দন্ডায়মান অবস্থায় করেছেন যা পুর্বের দুটি আয়াতের মর্মে বুঝা যায়। ইবনে কাছির তাঁর আল বিদায়া ও নিহায়া গ্রন্থে ২য় খন্ডে ২৬১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন" দোয়া ইব্রাহিমু আলাইহি ওয়া সাল্লামু ওয়াহুয়া কায়েমুন "অর্থাৎ উক্ত দোয়া করার সময় ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম দন্ডায়মান ছিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন "আনা দুয়াওতু ইব্রাহীমা" আমি হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর দোয়ার ফসল।" হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌র নিকট থেকে চেয়ে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আরবের ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশে নিয়ে এসেছেন। এটা উপলব্ধির বিষয়। আশেক ছাড়া এ মর্ম অন্য কেউ বুঝবে না। বর্তমান মিলাদ শরিফে রাসূলে পাঁকের আবির্ভাবের যে বর্ণনা দেয়া হয় তা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর দোয়ার তুলনায় সামান্যতম অংশ মাত্র। সুতরাং আমাদের মিলাদ শরিফ পাঠ ও কিয়াম হযরত ইব্রাহীম আলাহিস সালামেরই সুন্নাত। [বেদায়া ও নেহায়া ২য় খন্ড ২৬১পৃষ্ঠা] হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবী করীম (সা) এর মিলাদ পাঠ ও কিয়াম: নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ৫৭০ বৎসর পুর্বে হযরত ঈসা আলাইহিস এর সালাম আবির্ভাব। তিনি তাঁর উম্মত হাওয়ারী (বনি ইসরাইল) কে নিয়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ শরিফ পাঠ করেছেন। উম্মতের কাছে তিনি আখেরী জামানার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম ও সানা সিফাত এবং আগমন বার্তা এভাবে বর্ণনা করেছেন: "হে আমার প্রিয় রাসূল! আপনি স্মরণ করে দেখুন ঐ সময়ের কথা যখন মরিয়মে তনয় ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছেন: হে বনী ইসরাইল, আমি তোমাদের কাছে নবী হয়ে প্রেরিত হয়েছি। আমি আমার পুর্ববর্তী তওরাত কিতাবের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং এমন এক মহান রাসূলের সুসংবাদ দিচ্ছি যিনি আমার পরে আগমন করবেন এবং তাঁর নাম হবে আহমদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম [সূরা আছ-ছফ ৬ আয়াত] হযরত ঈসা সাল্লাল্লাহু আলাইহি হিস্ সাল্লাম এর ভাষণ সাধারনত দন্ডায়মান হতো আর এটাই ভাষণের সাধারণ রীতি ও বতে। ইবনে কাছির- আল বিদায়া ও নিহায়া গ্রন্থের ২য় খন্ডে ২৬১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: "আখাতোবা ঈসা আলাইহেস সালামু উম্মাতাহুল হাওয়ারিইনা কায়েমা" "অর্থ্যাৎ হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দন্ডায়মান (কিয়াম) অবস্থায় তাঁর উম্মৎ হাওয়ারীদেরকে নবীজীর আগমনের সুসংবাদ দিয়ে বক্তৃতা করেছেন"। সুতরাং মিলাদ ও কিয়াম হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর সুন্নাত এবং নবীযুগের ৫৭০ বৎসর পুর্ব হতেই। [আল বিদায়া ও নিহায়া] প্রমাণ নং-০৫ সাহাবায়ে কিরাম হলেন সত্যের মাপকাঠি, ঈমানের মানদন্ড। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হলেন সাহাবায়ে কিরাম। তারা আল্লাহ্‌কে রাজি করিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌ও তাদের প্রতি খুশি হয়েছেন তাইতো তাদের পদবী রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু। দয়াল নবীজি বলেছেন আমার একেকজন সাহাবী আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। সাহাবায়ে কিরামরকে অবশ্যই অনুসরণ করা আমাদের জন্য ওয়াজিব। আমাদের মধ্যে বাতিলপন্থী মুসলমানেরা বলে থাকে সাহাবায়ে কিরামরা নাকি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করেন নি! এটা তাদের সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।

পূর্বে আমরা হযরত আব্বাস রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু ও হযরত দ্বারদা রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে মিলাদুন্নবী পালন ও এর ফজিলত দেখেছি। এবার সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ৪ সাহাবী অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র জবান থেকে মিলাদুন্নবী পালনের ফজিলত শুনবো।

ইসলামের প্রথম খলিফা, সাহাবায়ে কিরামদের মধ্যে সর্ব উচ্চ মর্যাদা লাভকারী সাহাবী হযরত আবু বকর রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপলক্ষ্যে এক দিরহাম খরচ করবে সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে। [আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং-৭] ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু বর্ণনা করেন- "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্মান করলো, সে অবশ্যই ইসলামকে জীবিত করলো"। [আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম,পৃষ্ঠা নং-৭] ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান গনি রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করার জন্য এক দিরহাম খরচ করল- সে যেন বদর ও হুনাইন জিহাদে শরীক হলো। [আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং-৮] ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্মান করবে সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আন নেয়মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃষ্ঠা নং- ৮] অতএব উপরোক্ত হাদিস গুলো থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কিরাম তথা খোলাফায়ে রাশেদীন মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করেছেন বিধায় এর ফজিলত বর্ণনা করেছেন, যদি উনারা মিলাদুন্নবী পালন না করতেন তাহলে এর ফজিলত বর্ণনার কোন প্রশ্নই আসেনা! সুতরাং যারা বলে সাহাবায়ে কিরাম মিলাদুন্নবী পালন করেন নি তাদের চেয়ে বড় মিথ্যুক আর হতেই পারেনা! মিলাদ পালনের ফজিলত পবিত্র ঈদে

মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালনের মধ্যে যে কত ফজিলত রয়েছে তা যদি কোন মুসলমান জানতো তাহলে জীবন দিয়ে হলেও এই পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করতো। যারা পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশি মনে উদযাপন করবে তাদের জন্য আমার নূর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে এমন এক সুসংবাদ দান করেছেন যা শুনলে প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয়ে প্রশান্তি চলে আসবে, আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে যাবে। আর এই সুসংবাদটি হলো যারা এই দিনকে উদযাপন করবে তারা হাসরের ময়দানে নাজাত পেয়ে যাবে, এই দিনটি তাদের নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে, তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হবে, এদের মাগফিরাতের জন্য ফেরেশ্‌তারা পর্যন্ত দোয়া করবে। পবিত্র হাদিস শরীফে আরো ইরশাদ হয়েছে- হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেন, একদা তিনি উনার গৃহে সাহাবায়ে কিরামদের নিয়ে একত্রিত হয়ে হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত শরিফ পাঠ করছিলেন। (এই দিনে হুজুর পৃথিবীতে আসছেন, স্বয়ং আল্লাহ্‌ উনার হাবিবের উপর দুরুদ সালাম দিয়েছেন) শ্রবণকারীরাও তা শুনে আনন্দ পাচ্ছিলেন। ঠিক ওই সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, তোমাদের জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেছে। এই হাদিসটি বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে এসেছে যেমন: মাওলুদুল কবীর, আত তানভীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযার, হকিকতে মোহাম্মদী (মিলাদ অধ্যায়), দুররুল মুনাজ্জাম, ইশবাউল কালাম। অতএব উপরোক্ত হাদিস শরিফ থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালনকারীদের জন্য নূর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফায়েত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুতরাং যারা এই পবিত্র মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপক্ষে কথা বলে তারা আর যাই হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত হতে পারেনা, মিলাদ সম্পর্কে দেওবন্দি আলেমদের অভিমত বর্তমানের দেওবন্দীরা যে সত্যিকারের মুর্খ, পাগল আর বাতিলপন্থী ওহাবী তা তাদের আকীদাগত কার্যকলাপ আর পাইকারী ফতোয়াবাজি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায়। তাদের যদি নুন্যতম কুরআন হাদিসের জ্ঞান আর তাদের পূর্বসুরী দেওবন্দীদের কিতাব সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকতো তাহলে এরা মিলাদ কিয়ামের বিপক্ষে পাইকারীভাবে শিরক, বিদাত ও কুফরের ফতোয়াবাজি করতো না আর তাদের পূর্বসুরী মুরব্বীদেরকেও কাফের বানিয়ে বাতিলের খাতায় ফেলতো না। মিলাদ কিয়ামের পক্ষে দেওবন্দী আলেমদের কিতাব হতে কিছু দলিল প্রমাণ অতি সংক্ষেপে আপনাদের খেদমতে পেশ করছি আর বর্তমান দেওবন্দীদের মুখোশ উন্মোচন করছি। সমস্ত দেওবন্দী আলেমদের দাদা ওস্তাদ হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজিরী মক্কী (রহ) যাকে ছাড়া দেওবন্দীদের কোনো অস্তিত্ব থাকেনা সেই উনি উনার 'ফায়সালায়ে হাফতে মাসায়ালা' কিতাবের ৫ পৃষ্ঠায় বলেন, ফকিরের (আমার) মত এই যে, আমি মৌলুদ শরিফের মাহফিলে শরিক হই। আর ইহাকে বরকতের কারণ মনে করিয়া প্রত্যেক বৎসর অনুষ্ঠান করিয়া থাকি এবং কিয়াম করার সময় খুবই স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করি।" হাজী এমদাদুল্লাহ মহাজিরী মক্কী (রহ) উনার 'শামায়েলে এমদাদীয়া' কিতাবের ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, "আমাদের অনেক দেওবন্দী আলেমগণই মিলাদ শরিফের বিরোধিতা করছে। কিন্তু আমি মিলাদ কিয়াম শরিফ জায়েযপন্থী আলেমগণের পক্ষেই গেলাম। যেহেতু মিলাদ কিয়াম জায়েয হওয়ার পক্ষে অনেক দলিলই মজুদ আছে তাহলে কেন এতো বাড়াবাড়ি। আমাদের জন্য তো মক্কা মদিনার অনুকরণই যথেষ্ট। আর যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিলাদ শরিফের মাহফিলে হাজির হন এমন বিশ্বাস রাখা হয় তাতে অসুবিধার কিছু নেই।" অতএব মিলাদের মাহফিলে হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে হাজির হওয়া অসম্ভব নয়। দেওবন্দীদের আরেক গুরু ওস্তাদ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী উনার 'এমদাদুল ফতোয়া' কিতাবের চতুর্থ খন্ডের ৪২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন "হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মিলাদ শরিফের মাহফিল সম্পূর্ণ জায়েয ও মুস্তাহাব। তা হিন্দুস্তানের প্রচলিত বিদাতের অন্তর্ভুক্ত হবেনা এবং মিলাদ শরিফের কিয়াম কখনো কুফরী হবে না।" থানভী সাহেব উনার 'তরীকায়ে মিলাদ' কিতাবের ৮ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ করেন, "ওই সকল কাজ অর্থাৎ শিরনী বিতরণ, মিলাদের কিয়াম অবশ্যই ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। এতে ক্ষতির কিছুই নেই এবং মিলাদের কিয়ামের ক্ষেত্রে কোন নিষেধ থাকতে পারেনা।" দেওবন্দীদের আরেক নির্ভরযোগ্য আলেম মাওলানা সমসুল হক ফরিদপুরী উনার তাসাউফ তত্ত্ব কিতাবের ৩৫ পৃষ্ঠা-৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শুধুই মিলাদের অসংখ্য বাব নিয়ে এসেছেন এবং ৪১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন " হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শানে যে কাসিদা পড়া হয় তাতে মহব্বত বাড়ে আর ওই মহব্বতের জোরে যদি কেউ মিলাদের কিয়ামে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে তাকে বিদাত বলা যাবেনা। আর হুজুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বসে বসে সালাম দেওয়া হুজুরের শানে বড়ই বেয়াদবী।" এখন রায় আপনারাই দিবেন কারা বিদাত করছে, কারা শিরক করছে আর কাদের ফতোয়ায় করা কাফের হচ্ছে?

ফেরেশ্‌তাদের মিলাদ পালন ফেরেশ্‌তাগণের কিয়াম: দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টা আল্লাহ্‌র ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা সর্বদা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নুরের পাখা রওজা মোবারকে সামিয়ানার মত বিস্তার করে দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন। অথচ আমরা

ফেরেশ্‌তাদের অনুকরণে ৫/১০ মিনিট দাড়িয়ে দুরূদ ও সালাম পেশ করলে বেদাত হয়ে যায় বলে এক শ্রেণীর আলেম ও মুসলমান নামধারী দুশমনে রাসূলরা ফতোয়া দিয় বসে! ফেরেশ্‌তারাও কি তাহলে বেদাতে লিপ্ত? এই প্রসঙ্গে একটি হাদিস শরিফ উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। "হযরত নোবাইহাতা ইবনে ওহাব রাহিমামুল্লাহ আলাইহি তাবেয়ী হতে বর্ণিত; একদিন হযরত কা'ব আহবার (তাবেয়ী) হযরত আয়েশা রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহার খেদমতে উপস্থিত হলেন, অতঃপর সাহাবায়ে কিরাম তথা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে-মানে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। হযরত কা'ব বললেন: এমন কোন দিন উদয় হয়না- যে দিনে ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা নাজিল হয়ে রাসূলুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারাক বেষ্টন করে তাঁদের নুরের পাখা বিস্তার করে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরুদ ও সালাম পাঠ করেন না। অতঃপর যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে তখন তাঁরা আকাশে আরোহন করেন এবং তাদের অনুরূপ সংখ্যায় (৭০হাজার) ফেরেশ্‌তা দ্বারা অবতরন করে তাদের মতই দুরুদ ও সালাম পাঠ করতে থাকেন। আবার কিয়ামতের দিন যখন জমিন (রওজা মোবারক) বিদীর্ণ হয়ে যাবে, তখন তিনি ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা দ্বারা বেস্টিত হয়ে প্রেমাস্পদের রুপ ধারন করে আসল প্রেমিকের সাথে শীঘ্র মিলিত হবেন।" - [দারমী ও মিশকাত বাবুল কারামত হাশিয়াহ] উল্লেখিত হাদিসে নিম্মোক্ত বিষয়গুলো খুবই গুরুত্বপুর্ণ ও প্রণিধানযোগ্য : ১. কা'ব আহবার রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওজা মোবারকে ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা নাজিল হতে নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। এটি উনার কারামতের প্রমাণ। [লোমআত] ২.আম্মাজান হযরত আয়েশা রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহার উপস্থিতিতে কা'ব এ সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৩. রওজা মোবারাকে দিনে ৭০ হাজার এবং রাতে ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা নাজিল হয় এবং তাদের ডিউটি হলো, রওজা মোবারক বেষ্টন করে নুরের পাখা রওজা মোবারকে সামিয়ানা স্বরূপ বিছিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুরুদ ও সালাম পাঠ করা। এটাই মিলাদ ও কিয়ামের সারাংশ। মুসলমানগণ ফেরেশ্‌তাদের অনুকরনে কিয়াম সহকারে দরূদ ও সালাম পড়ে থাকেন। - [আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত] ৪. হাদিসে উল্লেখিত "মিসলাহুম" শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে সব সময় নিত্য নতুন অন্য একদল ফেরেশ্‌তা আসেন। জীবনে একবারই তাঁরা এ সুযোগ পেয়ে থাকেন। ৫. উক্ত ফেরেশ্‌তারা অন্য কোন আমল না করে কিয়াম অবস্থায় শুধু দরূদ ও সালাম পড়েন। ৬. রওজা মোবারকে পালাক্রমে দিন রাত ২৪ ঘন্টাই মিলাদ ও কিয়াম হয়। ৭. মিলাদ মাহফিলে উত্তম ভাবে আলোকসজ্জা করা ও সামিয়ানা টাঙ্গানো বৈধ। ৮. হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানোর জন্য চোখের সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত নয়। কেননা, ফেরেশ্‌তাদের চোখের সামনে শুধু রওজা মোবারাক পরিদৃষ্ট ছিল। ৯. কিয়ামতের দিবসে পর্যন্ত কিয়াম সহ দুরুদ ও সালামের এই ধারা অব্যাহত থাকবে। দুশমনেরা তা বন্ধ করতে পারবে না। ১০. কিয়ামতের দিবসে রওজা মোবারক অক্ষত থাকবে ধ্বংস হবে না। ১১. রোজ হাশরে ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পরিবেস্টন করে ও জুলুস করে খোদার দরবারে নিয়ে যাবে। নবীজির জুলুস করা ফেরেশ্‌তাগণের ই সুন্নত। ১২. সে দিন আল্লাহ্ হবেন হাবীব এবং নবী (সা) হবেন তার মাহবূব। হাদিসে উল্লেখিত "ইয়ারকাউনা" শব্দটি বাবে নাছারা হতে উৎপন্ন ক্রিয়া পদ। মুল ধাতু "ঝিফাফুন" অর্থ মিলন। খোদার সাথে সে দিন প্রিয় মাহবুবের মিলন হবে। - [লোমআত] "আমরা মিলাদুন্নবীর মাহফিল জীবন ভর করে যাবো। হে নজদীগণ (আব্দুল ওয়াহাব নজদীর অনুসারীগণ)! তোমরা জ্বলতে থাক। জ্বলে মরাই তোমাদের কাজ মিলাদ ১২ই রবিউল আউয়াল নাকি অন্য কোন দিন আমাদের মধ্যে অনেক বাতিল ফিরকার অনুসারীরা আমরা যারা ১২ই রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করে থাকি তাদেরকে বলে থাকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ১২ই রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন নি, তাহলে তোমরা ১২ই রবিউল আউয়াল তা পালন করো কেন? আমরাও মানি রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিলাদত শরিফ নিয়ে মতানৈক্য আছে, কিন্তু উলামায়ে কিরাম এবং উম্মতে মোহাম্মদীর সিংহভাগই ১২ই রবিউল আউয়াল এর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন এবং সহীহ হাদিস শরিফ থেকেও এটা নিশ্চিত প্রমাণিত হয়। হাফিজে হাদীস হযরত আবু বকর ইবনে আবী শায়বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেটা বিশুদ্ধ সনদে হাদীস শরীফে বর্ণনা করেন, হযরত আফফান রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মীনা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাবির ও হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উনার বিলাদত শরিফ হস্তি বাহীনি বর্ষের ১২ই রবীউল আউয়াল সোমবার শরিফ হয়েছিল।" [মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বুলুগুল আমানী শরহিল ফতহুর রব্বানী, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া] ইবনু হিশাম বলেন, আল্লামা তাবারী ও ইবনু খালদূনও বলেন ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিনে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। [তাহযীবু সীরাতে ইবনু হিশাম ৩৬ পৃঃ, তারিখুল উমাম অলমুলক ১ম খন্ড, ৫৭১ পৃঃ] অতএব উপরোক্ত সহীহ হাদিস শরিফের আলোকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার দিনে বিলাদত শরিফ লাভ করেন। ১২ই রবিউল আউয়াল কেন শোকের

দিন নয় আমরা কেন শোক পালন করিনা আমরা মদিনাওয়ালার আশেক পাগল গোলামেরা ১২ই রবিউল আউয়াল রাহমাতুল্লিল আলামিন নবীজির শুভাগমনে খুশি হয়ে জসনে জুলুস ও ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্‌যাপন করে থাকি। কিন্তু রাসূল বিদ্বেষী একদল মুনাফেক মুসলমান বলে থাকে ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখেতো রাসূল মারা গেছেন! (নাউজুবিল্লাহ) তাহলে খুশি প্রকাশ কর কেন? এই দিন শোক প্রকাশ করনা কেন? এটা একটা শয়তানী যুক্তি মাত্র। তাদের এই শয়তানী যুক্তির জবাব আমরা কুরআন সুন্নাহর দলিল দিয়েই দেবো ইন্‌শাহ আল্লাহুল আজিজ।

কেউ যদি বলে নবীজি মারা গেছেন এটা নবীজির শানে চরম বেয়াদবী এবং জঘন্য কুফুরী। কেননা নবীজি হলেন হায়াতুন্নাবী। আজ থেকে ১৫০০ বছর পূর্বে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সময়ের জন্য ইন্তিকালের স্বাদ গ্রহণ করেছিলেন মাত্র কিন্তু আমাদের মত মারা যাননি। মারা যাওয়ার অর্থ হলো দেহ থেকে রূহ স্থায়ীভাবে পৃথক হয়ে যাওয়া। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহ সাময়িক সময়ের জন্য পৃথক হয়েছিল মাত্র। হাদিসে কুদসীতে এসেছে "সুম্মা রাদ্দাল্লাহু রুহুয়াহু সুবা রুহুয়াহু" অর্থাৎ নবীজির ইন্তিকালের পর উনার রূহ মোবারক সাথে সাথে আল্লাহ্ উনার দেহ মুবারকে ফিরিয়ে দিয়েছেন"। আবু দাউদের হাদিস হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ২য় খন্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় এসেছে "আল্লাহ্‌র হাবিব ইরশাদ করেন এই প্রথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে যখনি কোন লোক আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ্ আমার রুহ আমি নবীর দেহে ফিরায়া দেন আমি রাসূল নিজের মুখে আমার উম্মতের

সালামের জবাব দেই। সুনান বাগজারে সহি সনদে বর্ণিত হাদিস, আল্লাহ্‌র হাবিব ইরশাদ করেন উনার সাহাবিদেরকে, আমার ওফাতের পর তোমরা বিলাপ করে কেদোনা। কেননা আমি রাসূল সবার মত মারা যাবোনা। আমি রাসূল রওজা শরিফ হতে তোমাদের আমল দেখতে পাবো। যখন দেখব তোমরা ভালো কাজ করছো তখন আমি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করবো আর যখন দেখবো তোমরা খারাপ কাজ করছো তখন আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবো। আল্লাহ্‌র পথে যারা শহীদ হয় তাদের তোমরা মৃত বল না। বরং তারা জীবিত। তবে তা তোমরা উপলব্ধি করতে পারো না।{সূরা বাকারা-১৫৪} উক্ত আয়াতের স্পষ্ট ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শহীদগণ কবরে জীবিত। আর ইংগিতের সাথে একথাও বুঝাচ্ছে যে, নবীগণও কবরে জীবিত। কেননা নবীগণের মর্যাদা শহীদদের তুলনায় অনেক উর্ধে। সুতরাং শহীদগণ যদি কবরে জীবিত থাকেন, তাহলে নবীগণ কেন হবেন মৃত? তারা অবশ্যই জীবিত। হযরত আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন নবীরা কবরে জীবিত। আর তারা সেখানে নামায পড়েন। {মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং-৬৮৮৮, মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদীস নং-৩৪২৫, সহীহ কুনুযুস সুন্নাতির নববিয়্যাহ, হাদীস} হায়াতুন্নাব্বী প্রসঙ্গে কুরআন হাদিসে শত শত দলিল রয়েছে। অতএব রাসূল মারা গেছেন বলা মানে কুরআন হাদিস অস্বীকার করা আর কুরআন হাদিস অস্বীকার করা মানে কাফের হয়ে যাওয়া। হযরত আবু সাঈদ আল খুদুরী রাদ্বি আল্লাহু তালা বর্ণনা করেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা কোন ওফাত প্রাপ্তের উপর তিনদিনের পর আর শোক প্রকাশ না করি, কিন্তু স্বামীর জন্য ৪ মাস দশ দিন পর্যন্ত স্ত্রী শোক প্রকাশ করতে পারে। [বোখারীঃ ২য় খন্ড, ৮০৪ পৃঃ, মুসলীম শরিফঃ ১ম খন্ড, ৮৮৬-৮৮৮ পৃঃ, তিরমিযি, আবু দাউদ ইত্যাদি] এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিন দিনের পর ওফাতের শোক প্রকাশ করা বৈধ নয়। অতএব কুরআন হাদিস প্রমাণ করে আমার নবীজি হায়াতুন্নাবী তাই উনাকে আমরা মৃত ভাবি না। আর উনাকে যারা মৃত ভাবে বা মৃত বলে তারা চরম পর্যায়ের গাফেল বেয়াদব এবং আকিদাগতভাবে কুফরী করে। আর তাদের কথায় তারাই মুর্খ তা প্রমাণ করে। কেননা এরা হাদিস পড়েনি আর মিথ্যা ফতোয়াবাজি করে। আর নবীজি বলছেন উনার জন্য শোক প্রকাশ না করার জন্য এবং যেকোনো মৃতের জন্য ৩ দিনের বেশি শোক প্রকাশ না করার জন্য। সুতরাং আমরা রাসূলের হাদিস মানি বলেই এই দিন শোক প্রকাশ করিনা। এখন যারা রাসূলকে মৃত বলে বা এইদিন শোক প্রকাশ করে তারা কি মুমিন হতে পারে? এরা কি হাদিস শরিফের অনুসরণ করে? এরা কি মুর্খ মুনাফেক নয়? সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় শয়তান ও তার সহযোগীরা ছাড়া সবাই দিনটিকে উদ্‌যাপন করেন, কেননা শয়তান চার বার উচ্চস্বরে কেঁদেছিল প্রথমবার যখন আল্লাহ্‌তা'লা তাকে অভিশপ্ত আখ্যা দেন; দ্বিতীয়বার যখন তাকে বেহেশ্‌ত থেকে বের করে দেয়া হয়; তৃতীয়বার যখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বেলাদত তথা ধরাধামে শুভাগমন হয়; এবং চতুর্থবার যখন সূরা ফাতিহা নাযিল তথা অবতীর্ণ হয় -[ইবনে কাসীর কৃত আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা]। এ পৃথিবীতে যত নেয়ামত রয়েছে বা এসেছে এর চেয়ে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে হাবিবুল্লাহ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহ্‌র এই নেয়ামত ও অনুগ্রহকে কেন্দ্র করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও আনন্দ উদযাপন করার নির্দেশ স্বয়ং রাব্বুল আলামিন দিয়েছেন যার প্রমাণ উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত। অতএব নবীজির শুভাগমনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত আর কি হতে পারে? আবার আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনের সূরা আম্বিয়ার ১০৭ নং আয়াতে দয়াল নবীজির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য ঘোষণা করেন" - অর্থাৎ নিশ্চয় আমি আপনাকে জগতসমূহের রহমত করেই প্রেরণ করেছি। হযরত দারদা রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু হতে

বর্ণিত আছে - তিনি বলেন আমি নবী করিম হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মদিনার আবু আমের আনসারির গৃহে গমন করে দেখি- তিনি তাঁর সন্তানাদি এবং আত্মীয়-স্বজনকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং বলছিলেন আজই সেই দিন। এটা দেখে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন: নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার উপর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র ফেরেশ্তাগণও তোমাদের সকলের জন্য মাগফিরাত কামনা করছেন। -[দুররে মুনাজ্জাম আব্দুল হক এলাহাবাদি] ২।ইবনে আব্বাস রাদ্বি আল্লাহু তালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে একদিন তিনি (ইবনে আব্বাস) কিছু লোক নিয়ে নিজগৃহে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করে আনন্দ উৎসব করছিলেন এবং তাঁর প্রশংসাবলী আলোচনা সহ দুরুদ ও সালাম পেশ করেছিলেন। এমন সময় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপস্থিত হয়ে এ অবস্থা দেখে বললেন: তোমাদের সকলের জণ্য আমার সাফায়াত অবধারিত হয়ে গেল"। -[ইবনে দাহইয়ার আত-তানভির ৬০৪ হিজরি] সুতরাং প্রমাণিত হলো যে নবী পাকের মিলাদ শরিফ পাঠে রাসূলে পাকের সাফায়াত নসীব হবে। অতএব কুরআন ও হাদিস শরিফ অনুসারে এটাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে যারা পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় খুশি উদ্‌যাপন করেনা, মনকে নারাজ রাখে, বিদাতের ফতোয়া দিয়ে মানুষকে আটকিয়ে রাখতে চায়, এই পবিত্র দিনের বিপক্ষে কথা বলে এরা হলো প্রকৃত শয়তানের অনুসারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মিলাদ শরিফ ও ক্বিয়াম শরিফ সম্পর্কে মক্কা শরিফ-মদিনা শরিফ-এর মুফতীগণের প্রাচিন ফতোয়ার কালেকশন আল্লামা আব্দুর রহীম তুর্কমানী (রহঃ) ১২৮৮ হিজরী সনে মক্কা ও মদিনা এবং জেদ্দাহ ও হাদিদার উলামায়ে কিরামের দ্বারা মিলাদ ও কিয়াম সম্পর্কে একটি ফতোয়া লিখিয়ে হিন্দুস্তানে নিয়ে আসেন এবং নিজ গ্রন্থ "রাওয়াতুন নাঈম"-এর শেষাংশে ছেপে প্রকাশ করেন। (আনওয়ারে ছাতেয়া দেখুন)

প্রশ্নঃ আল্লাহ্ তায়ালার অসীম রহমত আপনার উপর বর্ষিত হোক। নিম্নে বর্ণিত বিষয়ে আপনার অভিমত ও ফতোয়া কি? "মিলাদ শরিফ পাঠ করা - বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জন্ম বৃত্তান্ত পাঠকালে কিয়াম করে সম্মান প্রদর্শন করা, মিলাদের জন্য দিন তারিখ নিদিষ্ট করা, মিলাদ মজলিসকে সাজানো, আতর গোলাপ ও খুশবু ব্যবহার করা। কুরআন শরিফ হতে সূরা ক্বিরাত পাঠ করা এবং মুসলমানদের জন্য খানাপিনা (তাবারুক) তৈরি করা - এই ভাবে অনুষ্ঠান করা জায়েয কিনা এবং অনুষ্ঠানকারীগণ এতো সাওয়াবের অধিকারী হবেন কিনা? বর্ণনা করে আল্লাহ্র পক্ষ হতে পুরস্কৃত হোন। -আব্দুর রহীম তুর্কমানী - হিন্দুস্তান, ১২৮৮ হিজরি।

মক্কা শরিফের ফতোয়াদাতাগণের জবাব ও ফতোয়া। অনুবাদঃ "জেনে নিন - উপরে বর্ণিত নিয়মে (কিয়াম) মিলাদ শরিফের অনুষ্ঠান করা মোস্তাহসান ও মুস্তাহাব। আল্লাহ্ ও সমস্ত মুসলমানের নিকট এটা উত্তম। ইহার অস্বীকারকারীগণ বিদআতপন্থী ও গোমরাহ্। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হুজুর (দঃ)-এর হাদিস আছে- "মুসলমান যে কাজকে পছন্দনীয় বলে বিবেচনা করেন - তা আল্লাহ্র নিকটও পছন্দনীয়"। (মুসলিম)। এখানে মুসলমান বলতে ঐ সমস্ত মুসলমানকে বুঝায়-যারা কামেল মুসলমান। যেমন পরিপুর্ন আমলকারী উলামা, বিশেষ করে আরবের দেশ, মিশর, সিরিয়া, তুরস্ক ও স্পেন-ইত্যাদি দেশের উলামাগন সলফে সালেহীনদের যুগ থেকে অদ্যাবধি (১২৮৮ হিঃ) সকলেই মিলাদ কিয়ামকে মুস্তাহসান, উত্তম ও পছন্দনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। সর্বযুগের উলামাগণের স্বীকৃতির কারণে মিলাদও কিয়ামের বিষয় বরহক। ওটা গোমরাহী হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

"আমার উম্মত গোমরাহ বিষয়ে একমত হতে পারে না" (আল হাদিস) সুতরাং যারা মিলাদ ও কিয়াম কে অস্বিকার করবে-শরিয়তের বিচারকের উপর তাদের যথাযথ শাস্তি প্রদান করা ওয়াজিব। (ফতোয়া সমাপ্ত) মক্কা শরিফের ফতোয়াদাতা মুফতীগণের স্বাক্ষর ও সিলমোহর ১। আল্লামা আব্দুর রহমান সিরাজ। ২। আল্লামা আহনদ দাহলান। ৩। আল্লামা হাসান। ৪। আল্লামা আব্দুর রহমান জামাল। ৫। আল্লামা হাসান তৈয়ব। ৬। আল্লামা সোলায়মান ঈছা। ৭। আল্লামা আহমদ দাগেস্তানী। ৮। আল্লামা আবদুল কাদের সামস। ৯। আল্লামা আব্দুর রহমান আফেন্দী। ১০। আল্লামা আব্দুল কাদের সানখিনী। ১১। আল্লামা মুহাম্মদ শারকী। ১২। আল্লামা আব্দুল কাদের খোকীর। ১৩। আল্লামা ইবরাহিম আলফিতান। ১৪। আল্লামা মুহাম্মদ জারুল্লাহ। ১৫। আল্লামা আব্দুল মুত্তালিব। ১৬। আল্লামা কামাল আহমেদ। ১৭। আল্লামা মুহাম্মাদ ছায়ীদ আল-আদাবি। ১৮। আল্লামা আলি জাওহাদ। ১৯। আল্লামা সৈয়দ আব্দুল্লাহ কোশাক। ২০। আল্লামা হোসাইন আরব। ২১। আল্লামা ইব্রাহিম নওমুছি। ২২। আল্লামা আহমদ আমিন। ২৩। আল্লামা শেখ ফারূক। ২৪। আল্লামা আব্দুর রহমান আযমী। ২৫। আল্লামা আব্দুল্লাহ মাশশাত। ২৬। আল্লামা আব্দুল্লাহ কুম্মাশী। ২৮। আল্লামা মুহাম্মদ বা-বাসীল। ২৯। আল্লামা মুহাম্মদ সিয়ুনী। ৩০। আল্লামা মুহাম্মদ সালেহ জাওয়ারী। ৩১। আল্লামা আব্দুল্লাহ জাওয়ারী। ৩২। আল্লামা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ। ৩৩। আল্লামা আহমদ আল মিনহিরাভী। ৩৪। আল্লামা সোলাইমান উকবা। ৩৫। আল্লামা সৈয়দ শাত্বী ওমর। ৩৬। আল্লামা আব্দুল হামিদ দাগেস্তানী। ৩৭। আল্লামা মুস্তফা আফীফী। ৩৮। আল্লামা মানসুর। ৩৯। আল্লামা মিনশাবী।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা আলমের জন্মভূমির পরিচয়

• জহুর-উল-আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম এবং তাওহীদের বাণী প্রচার প্রসঙ্গ:

বাংলা ভূখণ্ডে কবে কিভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু হয় এর কোন সঠিক তথ্য নিরূপন করা সম্ভব নয়। তবে বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম সামুদ্রিক বন্দর প্রবেশ দ্বার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে-এ বিষয়ে কোন ভিন্নমত নেই। গৌড়ে বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠার বহুপূর্ব থেকে এ ভূখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে সংখ্যালঘু মুসলিম জনবসতির তথ্য ইতিহাসে সন্নিবেশিত আছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাসের অস্তিত্ব দেখা যায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায়। এ তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন হুজুর (দঃ) এর সাহাবারা (রাঃ)। অর্থাৎ অলি-দরবেশ, সাধকদের আগমনের অনেক পূর্বে বাংলা জনপদে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দিন বখতেয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের বহু পূর্বে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে অনেক অলি-দরবেশের আগমন ঘটে। অতি সুপরিচিত দরবেশদের একজন হলেন **বাবা আদম শহীদ**। ইতিহাসবিদদের অনেকে তাঁকে বাংলায় আগমনকারী প্রথম সুফিদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেন। বাবা আদম শহীদের বাংলায় আগমন সময়ে রাজা বল্লাল সেনের রাজধানী ছিল মুন্সিগঞ্জ জেলার রামপালে। এ সময় সেখানে গরু কোরবানী দেয়া নিষিদ্ধ ছিল। তবে রামপালের অদূরে কানাই চাং এলাকায় এক মুসলিম নিজ পুত্র সন্তানের আক্বীকার জন্য গরু কোরবানী দেয়। এ সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে বল্লাল সেন উক্ত মুসলমানের উপর চরম নির্যাতন শুরু করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উক্ত মুসলিম পরিবারের জীবন নাশের শংকা তীব্রতর হলে তিনি জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে পালিয়ে মক্কা শরিফ চলে যান। সেখানে ভাগ্যক্রমে বাবা আদম শহীদের সঙ্গে তার সাক্ষাত ঘটে। বাংলা থেকে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আসা মুসলিম ব্যক্তিটি ধর্মীয় কারণে মুসলিম নিপীড়নের বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাবলী বাবা আদম শহীদ সমীপে উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত ঘটনা অবহিত হয়ে বাবা আদম শহীদ ছয় থেকে সাত হাজার অনুসারীসহ মুন্সিগঞ্জের রামপালে উপস্থিত হন। রামপালে অবস্থান করে তিনি বল্লাল সেনের কার্যাবলীর প্রতিবাদ হিসেবে বেশ কিছু গরু কোরবানী দেন। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে বল্লাল সেন বাবা আদম শহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। যুদ্ধে বাবা আদম শহীদ শাহাদত বরণ করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এ ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে বল্লাল সেন স্বপরিবারে স্বেচ্ছায় অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে মারা যান। বল্লাল বাড়ীর অদূরে রামপালে একটি মসজিদের পাশে বাবা আদম শহীদের মাজার পূণ্যস্থান হিসেবে এখনো সাধারণ মানুষের মানসপটে তাওহীদী ভাবনার উদ্রেক ঘটনায়। উপর্যুক্ত ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলায় মুসলমানদের বসবাস বাবা আদম শহীদের আগমন পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল।

বাংলায় প্রথম দিকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে আগত সুফিদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন নেত্রকোণা জেলার মদনপুরের হযরত শাহ সুলতান রুমী (রহঃ)। এরপর বিখ্যাত সুফি হলেন বগুড়ার মহাস্থান গড়ের হযরত **শাহ সুলতান মাহি সওয়ার (রহঃ)**। মাহি সওয়ার (রহঃ) ছিলেন বলখের রাজপুত্র। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু আরাম-আয়েশের বিলাসী জীবন তাঁর নিকট পছন্দনীয় হয়নি। ফলে রাজসুখ পরিত্যাগ করে দামেস্কে বসবাসরত বিখ্যাত সুফি হযরত শায়খ তাওফিকের (রহঃ) শিষ্যত্ব গ্রহন করেন। তালিম প্রদানের এক পর্যায়ে শায়খ তাওফিক (রহঃ) হযরত শাহ সুলতান মাহি সওয়ারকে (রহঃ) বাংলা অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। শাহ সুলতান মাহি সওয়ার (রহঃ) বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় দ্বীপ সন্দ্বীপ হয়ে হরিরাম নগরে উপস্থিত হন। সেখান থেকে বগুড়ার মহাস্থান গড়ে আগমন করে ঘটনা পরম্পরায় স্থানীয় রাজা পরশু রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হন। যুদ্ধে পরশু রাম নিহত হন এবং তাঁর বোন সীলাদেবী করোতোয়া নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন। বাংলার সুফি ব্যক্তিত্বদের মধ্যে শাহ সুলতান মাহি সওয়ার অতি উচ্চ স্তরের তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাদৃত আছেন। পাবনার শাহজাদপুরের বিখ্যাত দরবেশ হযরত **মকদুম শাহ দৌলা শহীদ** হলেন মহানবী (দঃ) এর সাহাবী হযরত মুয়াজবিন জাবালের (রাঃ) অধস্তন বংশধর। তিনি হযরত শামসুদ্দিন তাবরেজীর (রহঃ) শাগরেদ। পীরের নির্দেশে বহু সংখ্যক আত্মীয় স্বজন এবং অনুসারী সহ তিনি বাংলায় আগমন করেন। বাংলায় আগমনের পথে তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত দরবেশ হযরত শাহজাহালাল বুখারির (রহঃ) সাক্ষাত ঘটে। (উল্লেখ্য যে চট্টগ্রামের চৌধুরী হাটের পশ্চিমে জালালাবাদ পাহাড়ের পাদদেশে হযরত শাহজালাল বুখারির মাজার আছে)। সাক্ষাতকালে হযরত শাহ জালাল বুখারি হযরত মখদুম শাহকে (রহঃ) উপহার স্বরূপ দুটি কবুতর দেন। সমুদ্র পথে

নৌকা বেয়ে বহু নদী পথ অতিক্রম করে স্বীয় পীরের নির্দেশ অনুযায়ী শাহ মকদুম (রহঃ) শাহজাদপুরে আগমন করেন। শাহজাদপুরের রাজা ছিলেন তখন একই সঙ্গে ধর্মবিহারের অধিপতি। তিনি তাঁর এলাকায় বিদেশীদের অবস্থান করতে বাধা দেন। এ কারণে হযরত মকদুম শাহ দৌলার (রহঃ) সঙ্গে রাজার যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধে কিছু সঙ্গীসহ হযরত মকদুম শাহ দৌলা শাহাদত বরণ করেন।

প্রফেসর ড. এনামুল হক বাংলার একজন বিখ্যাত ধর্ম প্রচারক হিসেবে হযরত মকদুম শাহ মাহমুদ গজনভী (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে উল্লেখ করেন, এ সুফি বর্ধমানের মঙ্গল কোটে ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। সে সময়কার স্থানীয় হিন্দু রাজা বিক্রম কেশরী (বিমাদিত্য) হিন্দু ধর্মাবলাম্বীদের প্রতি অত্যন্ত উদার এবং বিনম্র আচরণ করলেও স্থানীয় মুসলমানদের প্রতি এতো বিরূপ এবং বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করতেন যে, তিনি মুসলমানদের চেহারা পর্যন্ত দেখতেন না। এ ধরনের বিদ্রূপ পূর্ণ অবস্থায় তাওহীদের বাণী নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত মকদুম শাহ মাহমুদ গজনভী (রাহী পীর) হযরত শাহ বাহাউদ্দিনকে (রহঃ) সঙ্গে নিয়ে মঙ্গল কোর্টের রাজধানী উজ্জয়নীতে প্রবেশ করেন। এ ঘটনা শুনে রাজা বিক্রম কেশরী হযরত মকদুম শাহ মাহমুদ গজনভীকে (রাহী পীর) তাঁর চেহারা না দেখার শর্তে মঙ্গল কোর্টের নদীর ওপারে বসবাসের নির্দেশ দেন। রাজা বিক্রম কেশরীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মকদুম শাহ মাহমুদ গজনভী নদীর ওপারে মঙ্গলকোট পরগনায় বসবাস করতেন থাকেন। বর্ধমান তখন দিল্লীর সুলতানের করদ এলাকাভুক্ত ছিল। ইতোমধ্যে দিল্লীর সুলতান প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক এবং প্রজা সম্পর্কীয় নির্দেশনা দিয়ে রাজা বিক্রম কেশরীর নিকট একটি পত্র পাঠান। পত্রটি ফার্সী ভাষায় লিখিত ছিল। রাজা, রাজ পরিষদ, রাজ পণ্ডিতদের কেউই ফার্সী ভাষা জানতেন না। ফলে পত্র পাঠান্তে উত্তর প্রদানের জন্য তাঁরা দরবেশ মকদুম শাহ মাহমুদ গজনভীর স্মরণাপন্ন হন। পত্র পাঠান্তে দরবেশ প্রয়োজনীয় উত্তর প্রদানের পাশাপাশি বর্ধমানের মুসলমানের সঙ্গে রাজার আচার-আচরণ এবং অস্পৃশ্য কার্যাবলীর বিবরণীও লিখে দেন। দিল্লীর সুলতান সামগ্রিক অবস্থা অবহিত হয়ে সতেরজন দরবেশের নেতৃত্বে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে বিরাট সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। ড. এনামুল হক এদের সাতজনের নাম তাঁর গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন সৈয়দ শাহ তাজ উদ্দিন, খাজা-ই-দীন চিশ্‌তি, শাহ হাজী আলী, শাহ সিরাজ উদ্দিন, শাহ ফিরোজ, পীর পাঞ্জতন এবং পীর ঘোরা শহীদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দরবেশদের কর্তৃত্বাধীন এ বাহিনী হযরত মকদুম শাহ মাহমুদ গজনভীর নেতৃত্বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজা বিক্রম কেশরীকে পরাজিত করলে রাজার বাহিনী পালিয়ে যায় এবং অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। মূলতঃ এটি মুসলমানদের প্রথম বঙ্গ বিজয়। তুর্কী বীর ইখতেয়ার উদ্দিন বখতেয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বে এটি সংঘটিত হয়। মঙ্গলকোট পরগনা এখনো নব্বই ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকা হিসেবে পরিচিত। ১৯৩৫ সালে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক উক্ত এলাকা পরিভ্রমণকালে সেখানে ১৮জন দরবেশের মাজার দেখতে পান। এলাকার জনগণ এ সকল দরবেশের প্রতি খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এর পর পাণ্ডুয়ায় আসেন হযরত মকদুম শেখ জালাল উদ্দিন তাবরীজি (রহ)। সেখানে তিনি সকল ধর্মের মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। পাণ্ডুয়ায় এখনো 'দরগাহ বাড়ী' নামে হযরত জালাল উদ্দিন তাবরিজীর (রহঃ) মাজার বিদ্যমান আছে। ড. এনামুল হক পাণ্ডুয়ায় অনেক চিল্লাহ্-খানকাহ্‌র অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং তাওহীদের মর্মবাণী সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার কারণে অনেক পুরানো নাম পরিবর্তন করে সেখানে অলি-দরবেশের নামে রাখা হয়।

বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সোনার গাঁও এলাকায় আসেন শায়খ শরফ উদ্দিন এয়াহিয়া মানেরী (রহঃ)। তিনি তখন যুবক। তাঁর শিক্ষক শায়খ শরফ উদ্দিন আবু তাওয়ামা (রহঃ) তাঁর প্রিয় ছাত্র মনোরীকে নিয়ে সোনারগাঁ পদার্পন করেন। হযরত শায়খ শরফ উদ্দিন এয়াহিয়া মনোরী (রহঃ) পবিত্র কুরআন, কুরআনের টীকা ভাষ্য, আইন শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, অংক শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জন করে পরিশেষে সুফিবাদে দীক্ষা নেন। এর ফলে তিনি প্রায় সময় মোরাকাবা-মোশাহেদা পদ্ধতিতে ধ্যানমগ্ন থাকতেন। একসময় তিনি বাংলা অঞ্চল ত্যাগ করে জন্মভূমি 'মনোরে' ফিরে যান। পরবর্তী সময়ে তিনি একজন বিখ্যাত সুফি হিসেবে পরিচিতি পান। ইতিহাসবিদদের মতে মনোরে ফিরে যাবার কারণে বাংলা অঞ্চল অত্যন্ত উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী দরবেশের দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হয়।

সিলেটের হযরত **শাহজালাল ইয়েমেনী (রহঃ)** নানামুখি ঘটনাপঞ্জী এবং কারামতের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ভাষী মানুষের নিকট অত্যন্ত সুপরিচিত তাসাওউফ ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তাঁর মামা সৈয়দ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য। শিক্ষা-দীক্ষা সুসম্পন্নের পর তাঁর মুর্শিদ 'মামা' কিছু মাটি হাতে দিয়ে এ মাটি যে এলাকার মাটির সঙ্গে মিলবে সেখানে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং তাওহীদের দীক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সফরে বের হবার নির্দেশ দেন। পীরের নির্দেশ মতো নিজ ভাগ্‌নে শাহ পরানকে (রহঃ) সঙ্গে নিয়ে হযরত শাহ জালাল (রহঃ) ভারত অভিমুখে রওনা দেন। দিল্লীতে তিনি হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার খানকায় গমন করেন। সেখানে শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ মাহবুবে

এলাহী হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (রহঃ) তাঁকে একজোড়া কবুতর প্রদান করেন। সফরের এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। সে সময় সিলেটের রাজা ছিলেন গৌড় গোবিন্দ। সিলেটের এ রাজা মুসলমানদের প্রতি সর্বদাই বিদ্রূপ পোষণ করতেন এবং জুলুম নির্যাতন চালাতেন। শেখ বুরহান উদ্দিন নামক সিলেটী এক মুসলিম সাধকের পুত্র সন্তানের আক্বীকার উদ্দেশ্যে গরু জবাইয়ের কারণে রাজা গৌড় গোবিন্দের নির্দেশে তখন বুরহান উদ্দিনের একমাত্র পুত্র সন্তানকে হত্যা করা হয়। সন্তান হারিয়ে শেখ বুরহান উদ্দিন বিমর্ষ-বিধ্বস্ত অবস্থায় গৌড়ে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি বাংলার সুলতানকে অবহিত করেন। গরুর বদলা হিসেবে শিশু সন্তান হত্যার ঘটনায় সুলতান খুবই ব্যথিত হন। রাজা গৌড় গোবিন্দকে শাস্তি প্রদানের জন্য সুলতান নিজ জামাতা সিকান্দর খান গাজীকে সৈন্যবাহিনীসহ সিলেট আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। রাজা গৌড় গোবিন্দের বিশাল হস্তী বাহিনী থাকায় সিকান্দর খান গাজী প্রথম পর্যায়ে সিলেট আক্রমণ ও বিজয় অর্জনে ব্যর্থ হন। সুলতান পুনরায় প্রধান সেনাপতি নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে অধিক শক্তিশালী সেনাবাহিনীসহ সেকান্দর খান গাজীকে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বারের অভিযানও ব্যর্থ হয়ে যায়। ঠিক এ সময় আউলিয়া সর্দার হযরত শাহজালালের (রহঃ) নেতৃত্বে ৩৬০ জন আউলিয়া সিলেট সীমান্তে উপস্থিত হন। সমস্ত ঘটনা অবহিত হয়ে হযরত শাহজালাল ঐশী শক্তি নিয়ে সুলতানের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদান করেন। এতে দ্রুত যুদ্ধের গতি ঘুরে যায়। যুদ্ধে গৌর গোবিন্দ বিশাল বাহিনী সমেত পরাজয় বরণ করে। হযরত শাহজালালের (রহঃ) নেতৃত্বে সিলেটের পাহাড় শীর্ষে তাওহীদের পতাকা উত্তোলন করা হয়। হযরত শাহ জালাল (রহঃ) এবং তাঁর সঙ্গী ৩৬০ জন আউলিয়ার অলৌকিক কর্মকাণ্ড এবং তাওহীদ প্রচারে সাহসী ভূমিকা বাংলাদেশের লোক সংস্কৃতি, ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং বাংলাদেশের জাতীয় ঐতিহ্য ও চেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। বাংলাদেশের অধ্যাত্ম সংস্কৃতি ও জীবন প্রবাহের একটি প্রাণবন্ত অধ্যায় হচ্ছে হযরত শাহজাহালাল (রহঃ) ও হযরত শাহ পরান (রহঃ) এর ঘটনা। উল্লেখ্য যে, সম্মুখ সমরে বিরাট বিজয় অর্জন করার পরে হযরত শাহজালাল (রহঃ) ব্যাপক সমর্থন থাকা সত্বেও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন নি। তিনি তাসাওউফ ধারায় তাওহীদ প্রচারে নিজেকে সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রাখেন।

বাংলাদেশে সুফি গবেষকদের মধ্যে অত্যন্ত সুপরিচিত নাম হচ্ছে **আঁখি সিরাজুদ্দিন ওসমান**। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত দরবেশ মাহবুবে এলাহী হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার খলিফা। পীরের নির্দেশে তাওহীদের বাণী নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি গৌড় এবং পাণ্ডুয়ায় আগমন করেন। ১৩৫৭ সালে ইন্তিকাল করলে গৌড়ের সাগর দিঘীর উত্তর পশ্চিম কোণায় তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তাঁর মাজার রয়েছে। প্রতি বৎসর ঈদ উল ফিতরের দিন তাঁর উরস্ সম্পন্ন হয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চলে আগত অন্যান্য বিখ্যাত দরবেশ হলেন হযরত মাকদুম জাহানিয়ান জাহান গস্ত, শায়খ রাজা বিয়াবনী, শায়খ আলাউল হক, শায়খ নূর কুতুব আলম প্রমুখ। উপর্যুক্ত দরবেশগণের মধ্যে খুবই সুপরিচিত এবং উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন শায়খ **নূর কুতুব আলম**। তিনি শায়খ আলাউল হকের পুত্র। শায়খ নূর কুতুব আলমের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণের সময় বাংলায় গনেশ নামের একজন হিন্দু সামন্ত নেতা ইলিয়াছ শাহী রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং গৌড়ের সিংহাসন দখলে নেন। গনেশ রাজা উপাধি ধারণ করে ফকির-দরবেশ, সাধক, আলেম-ওলামাসহ সাধারণ মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন শুরু করেন। গনেশ ঘোষণা দেন যে, গৌড়ের সিংহাসনে আর কখনো কোন মুসলিম শাসক আসবেনা এবং হিন্দু জনগোষ্ঠী কখনো মুসলমান সুলতানের মাধ্যমে শাসিত হবেনা। রাজা গনেশের কর্মকাণ্ড এবং নানা প্রকার হুমকি আত্মস্থ করে শায়খ নূর কুতুব আলম জৈনপুরের সুলতান ইব্রাহীম শরকীর নিকট সহায়তা পাবার লক্ষ্যে পত্র প্রেরণ করেন। বাংলার সার্বিক পরিস্থিতি অবহিত হয়ে ইব্রাহীম শরকী, বাংলা আক্রমণ এবং গনেশকে শাস্তি প্রদানের মানসে শায়খ আলাউল হকের শিষ্য মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমানীকে শায়খ নূর কুতুব আলম সমীপে প্রেরণ করেন। একই সঙ্গে বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে সুলতান ইব্রাহীম শরকী ফিরোজপুরে আগমন করলে গনেশ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে শায়খ নূর কুতুব আলম এর নিকট গমন করেন। রাজা বিনম্রভাবে শায়খ সমীপে উপস্থিত হয়ে সুলতান ইব্রাহীম খরকীকে ফিরে যাবার জন্য নির্দেশ দিতে অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন। এ পর্যায়ে শায়খ নূর কুতুব আলম গনেশকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহ্বান জানান। ভীত বিহ্বল গনেশ শায়খ নূর কুতুব আলমের আহ্বানে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হন। তাঁর স্ত্রী এ সিদ্ধান্তে একমত না হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করার হুমকি দেন। এমতাবস্থায় গনেশ তাঁর ১২ বৎসরের কিশোর পুত্র যদুকে শায়খ সম্মুখে আনয়ন করেন এবং তাঁকে ধর্মান্তরিত করার অনুরোধ জানান। এ সময় শায়খ নূর কুতুব আলম স্বীয় মুখ থেকে একটু পান যদুকে চুষতে দেন। এতে যদু ধর্মান্তরিত হয়ে সুলতান জালাল উদ্দিন মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ ঘটনার পর শায়খ নূর কুতুব আলম সুলতান ইব্রাহীম খারকীকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করে স্বসৈন্যে জৌনপুরে ফিরে যাবার অনুরোধ করেন। এতে শায়খের সঙ্গে ইব্রাহীম খারকী এবং তাঁর কাজীর তর্ক-বিতর্ক হয়। এ পর্যায়ে শায়খ নূর কুতুব আলম ঘোষণা দেন যে,

বাংলার শাসন ব্যবস্থা যখন হিন্দু সামন্তের দখলে চলে যায় এবং তিনি যখন সাধারণ মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছিলেন তখনই প্রয়োজনের তাগিদে ইব্রাহীম খারকীকে বাংলা আক্রমনে উৎসাহ দিয়েছেন। শয়খের মতে যেহেতু বর্তমানে পুনরায় একজন মুসলিম সুলতান গৌড়ে অধিষ্ঠিত হচ্ছেন তখন আর আক্রমণ ও অহেতুক রক্তপাত অপ্রয়োজনীয় বিষয়। উল্লেখ্য যে, নূর কুতুব আলম শুধু ধর্ম প্রচার এবং খানকাহতে অবস্থান করে নিজেকে দরবেশ পরিচিতিতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। বরং তিনি সমকালীন বৈরী রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জীতে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থেকে এর শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রমাণ রাখেন। হযরত নূর কুতুব আলম ব্যক্তিগতভাবে একজন যশ খ্যাতি সম্পন্ন বিখ্যাত দরবেশ। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তিনি এক বিরল উপমা। মানবিক গুণাবলী এবং আধ্যাত্মিক শুদ্ধিতা অর্জনের লক্ষ্যে একজন খ্যাতিমান দরবেশের উপযুক্ত সন্তান হওয়া সত্ত্বেও হযরত নূর কুতুব আলম সবসময় গৃহভৃত্যের মতো কথিত হীন-নীচ প্রকৃতির সকল কাজ নিঃশংক চিত্তে সম্পন্ন করতেন। এগুলোর মধ্যে ফকির দরবেশ এবং মুসাফিরদের কাপড় ধৌত করা, তাঁদের জন্য তৈল-পানি আনয়ন করা, শীতকালে সার্বক্ষণিকভাবে গরম পানি প্রস্তুত রাখা, পিতার শরীর পরিষ্কার রাখা, খানকাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার পরিচ্ছন্নতার কাজ সমূহ তিনি নিজ হাতে সম্পন্ন করতেন। তিনি রাজ দরবারে উজীরের পদ গ্রহণের অনুরোধ কোন প্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়া প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মাজার চৌতি দরগাহ্ বা ছয় হাজারী দরগাহ্ নামে পাণ্ডুয়াতে অবস্থিত। তাঁর দরগাহ ঘিরে শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স বিদ্যমান আছে।

মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী ছিলেন পাণ্ডুয়া শায়খ আলাউল হকের শিষ্য। তিনি ছয় বছর বাংলা এলাকায় শায়খ আলাউল হকের নিকট অবস্থান শেষে নিজ এলাকা জৈনপুরে ফিরে যান। শায়খ আলাউল হকের ইন্তেকালের পর তিনি জৈনপুরে অবস্থান করেন। তিনি বিখ্যাত কাসওয়াচা খানকাহ শরিফের প্রতিষ্ঠাতা। হযরত নূর কুতুব আলম এর সমসাময়িক দরবেশদের একজন হলেন **শায়খ বদরুল ইসলাম**। রাজা গনেশের সঙ্গে তাঁর ঘটনাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদিন শায়খ বদরুল ইসলাম রাজা গনেশকে কুর্নিশ না করে রাজার সম্মুখে বসে পড়েন। রাজাকে কুর্নিশ না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে এ নিয়ে শায়খ উপেক্ষা সম্বলিত চাতুর্যপূর্ণ জবাব দেন। অন্য একদিন রাজা গনেশ অত্যন্ত নীচ কক্ষে বসে আছেন। কক্ষের দরজা খুবই ক্ষীণ ও খর্ব ছিল। শায়খ বদর-উল-ইসলাম দেখলেন এটি অবনত মস্তকে রাজা সমীপে উপস্থিত হবার একটি হীন কৌশল। এমতাবস্থায় তিনি গৃহে প্রবেশ কালে প্রথমে পা ঢুকিয়ে দেন এবং দেহকে চিতিয়ে প্রবেশ করেন, যাতে তাঁর মাথা কোন অবস্থায় নত না হয়। এ অবস্থা দর্শনে রাজা গনেশ ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে হত্যার আদেশ দেন।

বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে আগত অন্যান্যের মধ্যে শায়খ হোসাইন জোক্কার পোশ পূর্ণিয়ায় খানকাহ প্রতিষ্ঠা করেন। শায়খ আনোয়ার হলেন শায়খ নূর কুতুব আলমের পুত্র। রাজা গনেশের অত্যাচারে যখন বাংলার মুসলমানরা অতিষ্ঠ তখন নূর কুতুব আলমের পুত্র শায়খ আনোয়ার পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, এটি অত্যন্ত দুঃখজনক যে আপনার মতো একজন সুউচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দরবেশ উপস্থিত থাকতে একজন মূর্তিপূজক কীভাবে মুসলমানদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাতে পারে। এ সময় হযরত নূর কুতুব আলম ধ্যান মগ্ন ছিলেন। পুত্রের আবেগ ও ক্ষোভ মিশ্রিত বাক্য শুনে নূর কুতুব আলমের ধ্যান ভেঙ্গে যায়। এ সময় তিনি জবাব দেন, "এ দুঃশাসনের অবসান তখনি ঘটবে যখন তোমাদের রক্ত এ ভূমিকাকে লাল করে দেবে।" শায়খ আনোয়ার তখন নিশ্চিত হন যে, তাঁর দরবেশ পিতার মুখ নিসৃত পবিত্র বাণী কখনো বিফল হবে না। উল্লেখ্য যে, এক পর্যায়ে রাজা গনেশ শায়খ আনোয়ার এবং তাঁর ভাইয়ের ছেলে শায়খ জাহিদকে হত্যা করে। এরপর রাজা গনেশ আর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকেননি। পরে তিনি নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। হযরত নূর কুতুব আলমের অন্য এক শিষ্য শায়খ হুশাম উদ্দিন মানিকপুরী ভারতের উত্তর প্রদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন।

বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে অতি পরিচিত তৃণমূল সমর্থিত গণসংগ্রামের নাম ফকির বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের সংগঠকরা ছিলেন হযরত বদি উদ্দিন শাহ মাদারের আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী। এ আধ্যাত্মিক পুরুষের মূল নাম বদিউদ্দিন। শাহ মাদার তাঁর উপাধি। তাঁর পিতার নাম আবু ইসহাক সামী। তাঁর পিতৃপুরুষের বসতভিটা সিরিয়ায়। হযরত বদি উদ্দিন শাহ মাদার সুপ্রসিদ্ধ নবী হযরত মুসা (আঃ) এর বড় ভাই হযরত হারুন (আঃ) এর অধস্তন পুরুষ। 'আকবর উল আখেয়ারে' উল্লেখ আছে যে, তিনি ১২ বৎসর কোন খাবার গ্রহণ করেন নি এবং শুধু এক টুকরা কাপড় পরিধান করতেন। তিনি এতো দীপ্ত উজ্জ্বল গৌড় বর্ণের, সুস্বাস্থ্য, মন মোহনী চেহারা, সুন্দর সুপুরুষ ছিলেন যে, তাঁকে ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে জনসম্মুখে আসতে হতো। কারণ তাঁর অত্যুজ্জ্বল রং এবং দ্যুতিমান চেহারার আকর্ষণে জনগণ, আগন্তুক এবং পথচারীরা বেদিশা হয়ে তাঁর চরণে লুটে পড়তেন। তিনি ১৩১৫ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৩৬ সালে ভারতের কানপুর জেলার মাখনপুরে ইন্তিকাল করেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আগমনের পর তিনি ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ভ্রমণ করেন এবং তাওহীদের বাণী

প্রচার করেন। তাঁর বাংলা অঞ্চলে আগমন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কোন তথ্য না থাকলেও অনেক পণ্ডিত নিশ্চিত ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে বাংলা অঞ্চলেও দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেন। বাংলা অঞ্চলে এখনো কঠোর কৃচ্ছ্রতা সাধনকারী মাদারী পন্থী ফকির-দরবেশদের বিচরণের তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে ড. মুহাম্মদ এনামুল হক উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের মাদারীপুর জেলা, চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী এবং মাদার্শা নামের গ্রাম সমূহের নামকরণ হযরত বদিউদ্দীন শাহ মাদারের নামানুসারে তাঁর অনুসারীরা রেখেছেন। এখনো বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁর ত্বরিকার অনুসারীদের উদ্যোগে বার্ষিক উরস্ মাহফিল সম্পন্ন হয়ে থাকে। বাংলার অনেক এলাকায় বিশেষত তাসাওউফের অনন্য বিশ্বকেন্দ্র মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সহ অনেক দরগাহে এক বসনধারী এ ধরনের ফকিরদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়।

চট্টগ্রামের লোকমুখে এক সময় সাহস, মনোবল এবং সমবেত হবার জন্যে আওয়াজ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো 'শাহ বদরের' নাম। চট্টগ্রামের মাঝি-মাল্লা, জোয়ান, যুবক এবং গ্রামের কৃষাণরা রাত-বিরাতে দীর্ঘ লয়ে 'বদর' শব্দে উচ্চকণ্ঠে শোর ওঠালে সবাই মনে করতো এক জায়গায় সমবেত হয়ে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে ডাক পড়েছে। চট্টগ্রামের লোকদের বিশ্বাস ছিল 'বদর' ডাক শুনলে জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেরত, দৈত্য-দানব সবই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। জনপ্রিয় শব্দ হওয়ায় 'শাহ বদর' নাম চট্টগ্রামে প্রবাদ প্রথার মতো আত্মিক বিশ্বাসগত লোক সংস্কৃতির আদলে পরিণত হয়। 'বদর' শব্দটি প্রখ্যাত আউলিয়া হযরত বদর শাহ এর নামের মূল অংশ। তাঁর দরগাহ্ এলাকাকে বলা হয় 'বদর পাতি'। ঐতিহাসিক তথ্যানুযায়ী প্রফেসর ড. আবদুল করিম উল্লেখ করেন যে, হযরত শাহ সুলতান মাহি সওয়ার হাজী খলিল পীর সহযোগে চট্টগ্রাম আগমন করে হযরত শাহ বদর পীর আউলিয়া এবং কদল খান গাজীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে চট্টগ্রামকে শত্রু মুক্ত করেন। চট্টগ্রামের জনগণ ও সচেতন মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস এ যে বদর শাহ যখন চট্টগ্রাম আগমন করেন তখন পাহাড় জঙ্গলে ভরপুর চট্টগ্রাম শহরে জীন-পরী-দৈত্য-দানবের অবাধ বিচরণ ছিল। এ কারণে চট্টগ্রাম শহরে তেমন কোন লোক বসতি ছিল না। বদর আউলিয়া এ ধরনের ভীত-বিহবল পরিস্থিতিতে দৈত-দানবের নিকট একটি বাতি জ্বালানোর অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে তারা তাতে সম্মতি দেয়। বদর শাহ আউলিয়া তখন চট্টগ্রামের চেরাগী পাহাড়ে আল্লাহ্‌র নামে একটি চড়ি বাতি জ্বালিয়ে দেন। এ বাতির আলোকে ঐশী বিস্তৃতি ঘটলে চট্টগ্রাম থেকে দৈত্য-দানব জীন-পরী পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে চট্টগ্রাম শহরে মানব বসতি শুরু হয়। এ কারণে চট্টগ্রামের লোক সমাজ চেরাগী পাহাড়কে এখনো পবিত্র স্থান হিসেবে স্মরণ করে থাকেন। বদর শাহের প্রজ্জ্বলিত চড়ি বাতির নামানুসারে চাটিগামের উৎপত্তি ঘটেছে বলে বিভিন্ন ইতিহাসবিদগণ মত প্রকাশ করেছেন।

বাংলা মুল্লুকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য আগত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার খড়মপুরের হযরত শাহ গেচু দরাজ কল্লা শহীদ, হুগলীর শাহ সাইফুদ্দিন, শাহ আনোয়ার কোতোয়ালী হালভী উল্লেখযোগ্য। এছাড়া কামরুপে রাজা কামেশ্বরকে পরাজিত করার যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মহানবী (দঃ) এর বংশধর শাহ ইসমাইল গাজী, অসংখ্য ভক্ত-আশেকের পরম শ্রদ্ধায় বরিত দিনাজপুরের দেবকোটে সমাহিত কুতুবুল আউলিয়া, ওয়াহেদুল মুহাক্কেকীন হযরত মোল্লা আতা, গুজরাট থেকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা অঞ্চলে আগত হযরত শাহ জালাল দাখিনী, রাজশাহীর বাঘা এলাকার মাওলানা শাহ দৌলা প্রমুখেরা নিজেদের চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং অলৌকিক কর্মকাণ্ডের জন্যে বাংলার মানুষের নিকট বিখ্যাত হয়ে আছেন।

বাংলার ভাটি অঞ্চলে প্রধানত অবহেলিত, নির্যাতিত গরীব মানুষের বসবাস ছিল। শ্রেণী বৈষম্যের কারণে অনাদর-অবহেলায় কষ্ট-কাষ্টে লালিত হওয়া আদম সন্তানগুলো নির্লোভ নিরহঙ্কারী মুসলিম সুফি দরবেশদের নীতি-নৈতিকতা এবং মানব সাম্যের আক্ষরিক কার্যাবলী লক্ষ্য করে অনুপ্রাণিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাওহীদের পতাকাতলে সমবেত হন। বাংলার পথে-প্রান্তরে গ্রামে গ্রঞ্জে সুফিদের বিচরণ এবং বাংলার মাটিতে পরম মমতায় নিজেদের মিশিয়ে নিয়ে চিরশায়িত থেকে বাংলার বায়ু, বাংলার প্রকৃতি, আলো বাতাস পরিবেশে তাঁরা বিশাল 'সুফি ক্ষেত্র' গড়ে তুলেছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাওহীদের মিশন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া সুফিদের অনেকে পরম সত্যবাদিতার জন্য উমাইয়া-আব্বাসীয় শাসকদের রোষানলে পতিত হয়েছিলেন। এ ধরনের নিরাপোষ চরিত্রের সুউচ্চ নৈতিকতায় বলীয়ান কোন কোন দরবেশ বাংলা মুল্লুকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছেন। এ সকল সুফিদের অনুপম ধর্মচর্চা প্রধানত তাওহীদ ভিত্তিক উদার চিন্তা চেতনা সম্বলিত পরমত সাহিষ্ণু ধারায় নির্বিরোধ কর্মভিত্তিক হওয়ায় বাংলা অঞ্চলে সুফিবাদ তথা তাসাওউফ পন্থীদের অবস্থান জনসমাজের বিশ্বাস ও কর্মের তৃণমূলে গ্রোথিত হয়ে আছে। অলি-দরবেশদের প্রতি এ বিশ্বাস ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের। অলি-দরবেশদের প্রতি এ ধরনের বিশ্বাসের ভিত্তি ভালবাসা, ভয় এবং উপলব্ধির পরিধিতে বিস্তৃত। বাংলার প্রতিটি লোকালয়ে অসংখ্য আউলিয়ার পদচারণা এবং পরশে বিমুগ্ধ-বিমোহিত বাংলা হাজার বছর ধরে তাসাওউফের ভূবন বিখ্যাত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আয়োজন এন্তেজাম করে 'মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ' এর উত্থান ঘটিয়েছে।

তাওহীদের সর্বজনীন এ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অগণিত আল্লাহ্ প্রেমিক অলি-দরবেশের ইবাদত-বন্দেগী এবং শহীদী রক্ত মাটিতে মিশিয়ে বাংলার জনপথকে প্রকৃত অর্থে তাসাওউফের উর্বর ভূমিতে পরিণত করেছে।

প্রখ্যাত সুফি মীর আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী উল্লেখ করেছেন বাংলায় এমন কোন শহর এবং গ্রাম নেই যেখানে পরম পবিত্র অলি-দরবেশগণ গমন করেননি অথবা বসবাস করেননি। তাঁরা বিভিন্ন এলাকায় খানকাহ্ প্রতিষ্ঠা করে প্রথমত তাওহীদে দীক্ষা দান করেন। পরবর্তীতে তাঁরা মসজিদ-মকতব গড়ে তুলে আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে ইসলাম ধর্মের বিধি বিধান অনুযায়ী অনুসারীদের প্রশিক্ষণ দেন। সুফি-দরবেশগণ ধর্ম প্রচারের কাজ এতো গুরুত্বসহকারে পালন করেন যে, তাঁদের প্রায় সকলেই চিরকালের জন্যে মাতৃভূমি, আত্মীয় পরিজন, সহায় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটে গেছেন। তাঁদের অনেকে মহানবী (দঃ) এর অন্যতম সুন্নাত বিবাহ-শাদী করার মতো চিন্তা ভাবনার অবসরও পাননি। অনেকে সার্বক্ষণিকভাবে ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী তাওহীদ প্রচারে এতো নিমগ্ন ছিলেন যে তাঁরা কার্যত সংসারত্যাগী সাধক হিসেবে জনমনে পরম ভালবাসায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাই দেখা যায় তাঁদের ইন্তিকালের পর তাঁদের কর্ম ও স্মৃতি চিহ্ন ধরে রাখার নিমিত্তে জনগণের শ্রদ্ধা-ভালবাসা এবং সম্মানের প্রতিক্রিয়া হিসেবে গড়ে ওঠে মাজার-দরগাহ্। এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, খানকাহ্, মসজিদ-মকতব, দরগাহ্ প্রতিটি স্থান অহর্নিশভাবে তাওহীদ প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে।

তাওহীদের কেন্দ্র হিসেবে চট্টগ্রাম:

তাওহীদ প্রচারের অনন্য কেন্দ্রভূমি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চট্টগ্রামের ভূমিকা অতি পুরানো। মদীনা সনদের ভিত্তিতে পৃথিবীর প্রথম আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর সাহাবাদের নিয়ে মসজিদে নববীতে মহানবী (দঃ) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এ বৈঠকে তিনি তাওহীদের বাণী নিয়ে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ার জন্যে সাহাবাদের নির্দেশনা দেন। মহানবীর (দঃ) নির্দেশনা পেয়ে বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম দেশ-বিদেশে মুবাল্লিগ হিসেবে ছুটে পড়েন। এঁদের মধ্যে আশরা মোবাশ্শরা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) অন্যতম একজন। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ নাজ্জাশী প্রদত্ত জাহাজে করে ইউথিওপিয়া বন্দর থেকে চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে চীনের ক্যান্টনে গমন করেন। এ প্রতিনিধি দল পথিমধ্যে চট্টগ্রাম বন্দরে বেশ কিছুদিন অবস্থান করে স্থানীয় লোকদের নিকট ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। ইসলাম ধর্মের বাণী চট্টগ্রামের মানুষ হযরত সাদ বিন আবিওয়াক্কাসের (রাঃ) মতো পৃথিবীতে অবস্থানকালে বেহেশ্তের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবার মাধ্যমে প্রথম পেয়েছেন। এটি চট্টগ্রামের সৌভাগ্য যে, মহানবীর (দঃ) পৃথিবীতে শারীরিক অবস্থানকালে তাওহীদের এ দাওয়াত আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষক সাম্প্রতিক সময়ে এ ঘটনাটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্রের দলিল হিসেবে উপস্থাপন করছেন। কোন কোন বর্ণনা মতে আরেকজন মোবাশ্শরা হযরত সাঈদ বিন যাইদ (রাঃ), হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাসের (রাঃ) সঙ্গী ছিলেন। এছাড়া প্রখ্যাত সাহাবী হযরত কায়স ইবনে হুযাইফা (রাঃ), হযরত উরওয়া ইবনে আছাছা (রাঃ), হযরত আবু কায়স ইবনে হারিস উক্ত প্রতিনিধি দলে মুবাল্লিগ হিসেবে অংশ নেন। এটি অত্যন্ত গৌরবজনক অধ্যায় এ জন্যে যে মহানবী (দঃ) প্রেরিত প্রথম মুবাল্লিগ দলের মাধ্যমেই খাতেমুল অলদের আবির্ভাব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত পৌঁছে।

চট্টগ্রাম বার আউলিয়ার পুণ্যভূমি। চট্টগ্রামের অলি-গলি, গ্রাম-গঞ্জে অলি-দরবেশদের মাজার, আস্তানা, আসন, চিল্লার স্থান, ফকিরটিলা প্রভৃতি জায়গার নাম ইতিহাস এবং স্থানীয় লোক কথায় উল্লেখ থাকতে দেখা যায়। সীতাকুণ্ডে বার আউলিয়ার আস্তানা, সুলতানুল আরেফিন হযরত বায়েজীদ বোস্তামীর আসন শরিফের পশ্চিমে বার আউলিয়ার আসন, ইব্রাহীম কটন মিলের (বর্তমানে PHP প্রতিষ্ঠান) বিপরীতে আউলিয়া মসজিদ, হাটহাজারী বাজারের পশ্চিমে ফকির মসজিদ, হাটহাজারী উপজেলার উদালিয়া গ্রামে ফকির টিলা, কাটিরহাট বাজার সন্নিকটস্থ ফকির তাকিয়া এ ধরনের অসংখ্য স্থান চট্টগ্রামে ফকির-দরবেশ আউলিয়াদের স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে স্থানীয় জনশ্রুতি এখনো বিদ্যমান আছে। চট্টগ্রামে সুলতান বায়েজীদ বোস্তামীর (রহঃ) আস্তানা, কদম রসুল, আলী কদম, বড় পীরের আসন প্রভৃতি নাম স্থানীয় এলাকায় খতিয়ানভুক্ত আছে। শাহ বদর আউলিয়া, শাহ মোহসেন আউলিয়া, হযরত শাহজাহান শাহ, মোল্লা মিসকিন শাহ, হযরত গরীবুল্লাহ্ শাহ, শাহ কাতাল পীর, সৈয়দ আক্রম আলী শাহ, আকবর শাহ, শাহ মনোহর প্রমুখ আউলিয়াদের বিচরণ, অবস্থান এবং মাজার চট্টগ্রামকে অলি-দরবেশ প্রভাবিত তাসাওউফের ঠিকানা হিসেবে বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত করেছে। লোক কথায় প্রচলিত আছে পূর্বে চট্টগ্রামের অনেক পাহাড়ে বিশেষত দেয়াং এর পাহাড়, জালালাবাদ পাহাড়, বারোইয়ার ঢালা এলাকা, ফটিকছড়ির খিরাম পাহাড় থেকে গভীর রাতে সুমধুর আজানের ধ্বনি ভেসে আসত। এ সবই যেন 'খাতেমুল অলদের' আবির্ভাব স্থানকে পুন্যভূমিতে রূপান্তরের ঐশী আয়োজন। (চলবে)

তাওহীদের সূর্য : মাইজভাণ্ডার শরিফ এবং বেলায়তে মোত্‌লাকার উৎস সন্ধানে

• জাবেদ বিন আলম •

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২. হযরত ওসমান (রাঃ) সম্পর্কে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এক খুতবায় উল্লেখ করেন, "বন্ধুগণ! আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। আল্লাহ্‌পাক আরশের উপরে আছেন। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তশরিফ আনয়ন করে আরশের পায়ার নিকট দণ্ডায়মান হন। অতঃপর সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) আসেন এবং রাসূলুল্লাহ্‌র (দঃ) স্কন্ধে হাত রেখে দাঁড়ান। এরপর হযরত উমর (রাঃ) আসেন এবং সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে যান। অবশেষে হযরত উসমান (রাঃ) আগমন করেন, কিন্তু তাঁর মস্তক তাঁর হাতে ছিল। তিনি তখন বলছেন ইয়া আল্লাহ্! আপনি আপনার বান্দাদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন, কোন্ অপরাধে তারা আমাকে হত্যা করেছে? এ কথা বলার পর সঙ্গে সঙ্গে জমিতে দুটি রক্তের নহর জারি হয়ে গেল।" হযরত আলীকে (রাঃ) উক্ত স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "হযরত হাসান (রাঃ) ঠিকই দেখেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "যদি সমস্ত লোক ওসমানের কতলের ব্যাপারে একমত হতো, তাহলে আসমান হতে পাথর বর্ষিত হতো।"

৩. হযরত ওসমান গনির (রাঃ) শাহাদতের পূর্বে বিদ্রোহের দিনগুলোতে জমজাহ ইবনে সায়ীদ গিফারী হযরত ওসমানের (রাঃ) হাত থেকে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) এর পবিত্র লাঠি বলপূর্বক ছিনিয়ে নিয়ে আপন হাঁটুতে রেখে ভেঙ্গে ফেলে। জনগণ এ ধরনের অপকর্ম দেখে 'হায় হায়' করে উঠেন। মহান আল্লাহ্ মুহূর্তেই জমজাহের হাঁটুতে একটি রোগ সৃষ্টি করে দেন। এ রোগে যথেষ্ট ভোগান্তির পর সে বছরই সে মৃত্যুবরণ করে। হযরত ওসমানের (রাঃ) খিলাফত কালীন সময়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের প্রকাশ্য সমালোচক ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ)। তিনি শাসন কার্য এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও কখনো হযরত ওসমানের (রাঃ) ব্যক্তিগত সমালোচনা করেননি বরং ব্যাপক প্রশংসা করেছেন। হযরত আবুজর গিফারী (রাঃ) হযরত ওসমানের (রাঃ) সুনাম বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি হযরত ওসমানকে (রাঃ) সদ্ভাব সহকারেই স্মরণ করব।"

বিদ্রোহ চলাকালে খলিফা হযরত ওসমানের (রাঃ) পক্ষে বিদ্রোহ দমন এবং তাদেরকে পবিত্র নগরী মদীনা থেকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিতাড়িত করা অত্যন্ত সহজ ছিল। এ ব্যাপারে সিরিয়া থেকে আমীর মোয়াবিয়া সেনাবাহিনী পাঠাতে অনুমতি চেয়েছিলেন। তা ছাড়া খিলাফতের ফৌজের পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা খুবই সহজ ছিল। কিন্তু মহানবী (দঃ) অনেক পূর্বেই এ বিষয়ে হযরত ওসমানকে (রাঃ) নিষেধ করেছিলেন এবং কোন অবস্থায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করে নিঃশংক চিত্তে শাহাদতের সুধা পানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে হযরত ওসমান (রাঃ) শাহাদতের দিন রোজা পালন করেছিলেন এবং শাহাদতের পর বেহেশ্‌তে মহানবী (দঃ), সিদ্দিকে আকবর (রাঃ) এবং ফারুকে আযমের (রাঃ) সঙ্গে ইফতারে সামিল হয়েছিলেন।

মওলা আলী (আঃ) প্রসঙ্গঃ

১. শেরে খোদা হযরত আলী হায়দার (রাঃ) আল্লাহ্‌র গৃহ কাবা শরিফে ভূমিষ্ঠ হন। ভূমিষ্ঠ হবার পর তিনি স্বচক্ষে প্রথম মহানবীকে (দঃ) দেখার পরম সৌভাগ্য লাভ করেন। মাতৃদুগ্ধ পান করার পূর্বে তিনি মহানবীর (দঃ) পবিত্র জিহ্বা লেহন করে অনুপম তৃপ্তি লাভ করেন। হযরত আলী (রাঃ) কিশোর বয়সে প্রথম পুরুষ হিসেবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন হুজুর (দঃ) এর সহোদর চাচা হযরত আবু তালিবের সন্তান (উল্লেখ্য যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবং হযরত আবু তালিব ছিলেন একই মায়ের সন্তান)। হুজুর (দঃ) যখন হযরত আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে ছিলেন তখন হযরত আলীর (রাঃ) জননী হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ পুত্রাধিক স্নেহে মহানবীকে (দঃ) লালন পালন করেন। কখনো তিনি মহানবীকে (দঃ) পিতৃ মাতৃ শূন্যতা অনুধাবন করতে দেননি। হযরত ফাতিমা বিনতে আসাদ ইন্‌তিকাল করলে হুজুর (দঃ) স্বীয় জামা কাফনের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। হুজুর (দঃ) নিজে কবরে শয়ন করে কবরের অলৌকিক প্রশস্ততা প্রদান করেন এবং ঘোষণা দেন, "কবরের মুখ গহবর থেকে ফাতিমা বিনতে আসাদ ছাড়া কোন ব্যক্তি নিরাপদ নয়।" রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফাতিমা বিনতে আসাদের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর ইন্‌তিকালের পর শিয়রে বসে উল্লেখ করেন, "হে আমার মায়ের পরে মা"। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলেছেন, হযরত আবু তালিব ব্যতীত অন্য কেউ ফাতিমা বিনতে আসাদের ন্যায় তার প্রতি স্নেহশীল ছিলেন না।" এ ধরনের পারিবারিক অন্তর্নিহিত সম্পর্কের আলোকে সুস্পষ্ট যে হযরত আলী (রাঃ) মহানবীর (দঃ) অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। হযরত খাদিজাকে (রাঃ) পত্নী হিসেবে বরণ করার পর মহানবী (দঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) স্বীয় পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তখন থেকে মহানবীর (দঃ) অন্দর-মহলের সবকিছু হযরত আলীর (রাঃ) নখ দর্পণে চলে আসে। অত্যন্ত নিকটতম হিসেবে

হযরত আলী (রাঃ) পরিপূর্ণ মাত্রায় মহানবীকে (রাঃ) পর্যবেক্ষণ, অনুরনন, অনুকরণ এবং অনুসরনে সক্ষম হন। মহানবীর (দঃ) সুগভীর সান্নিধ্য প্রাপ্তির কারণে হুজুর (দঃ) উল্লেখ করেছেন, "আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী এর দরজা।"

হযরত আলী (রাঃ) আহলে বাইত, জঙ্গে খায়বরে দুর্ভেদ্য কামুস দূর্গ পদানতকারী। মহানবী (দঃ) বলেছেন, "হে আলী! যে ব্যক্তি মুমিন হবে, সে অবশ্যই তোমার প্রতি মহব্বত রাখবে। যে ব্যক্তি মোনাফিক, সে তোমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে।" হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) উল্লেখ করেন, "হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ দ্বারাই আমরা মোনফিক চিনে নিতাম।"

২. বিদায় হজ্ব সম্পন্ন করে আরাফাতের ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দানের পর মহানবী (দঃ) হজ্ব পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে মদীনা শরিফের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে 'গদীরে খুম' নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণকালে বোরাইদা আসলামীর বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মহানবী (দঃ) ঘোষণা দেন, হে বোরাইদা! আলী সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা রেখো না। কারণ আমি আলী হতে এবং আলী আমা হতে।" এরপর সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক নির্দেশনা হিসেবে মহানবী (দঃ) সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "হে লোক সকল! আমি মানুষ। আল্লাহ্‌র ফেরেশ্‌তা হয়তো অতি শীঘ্রই আসবেন এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ আমাকে গ্রহণ করতে হবে। আমি তোমাদের নিকট দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহ্‌র কুরআন, যেখানে হেদায়ত এবং আলো পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। অপরটি আমার পরিবার (আহলে বাইত)। তাদের বেলায় আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র নির্দেশনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। দেখি তোমারা তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর। আল্লাহ্ আমার মওলা, আর আমি সমস্ত মুসলমানের মওলা।" "আর আমি তোমাদের নিজেদের ওপর তোমাদের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং সবচেয়ে বেশি যোগ্যতা সম্পন্ন। সুতরাং হে লোক সকল আমি যার মওলা, এই আলীও তার মওলা। হে আল্লাহ্! যে তাকে সমর্থন করবে তাকে তুমিও সমর্থন কর। যে তার সাথে শত্রুতা করবে, তার সাথে তুমিও শত্রুতা কর। যে তাকে ভালবাসবে তাকে তুমিও ভালবাস। যে তাকে ঘৃণা করবে তুমিও তাকে ঘৃণা কর। যে তাকে সাহায্য করবে, তাকে তুমিও সাহায্য কর এবং যে তাকে সাহায্য থেকে বিরত থাকবে, তাকে তুমিও সাহায্য থেকে বিরত থাক এবং সে যে দিকে ঘুরে, সত্যকেও তার সাথে সে দিকে ঘুরিয়ে দাও।" মহানবী (দঃ) ঘোষণা করেন দুটি পবিত্র জিনিস আমি রেখে যাচ্ছি, একটি মহান আল্লাহ্‌র কিতাব, যার একপ্রান্ত মহান আল্লাহ্‌র হাতে এবং অপর প্রাপ্ত তোমাদের হাতে আছে এবং অপরটি আমার আহলে বাইত (পবিত্র বংশধর)। মহান আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন, এ দুই স্মৃতি চিহ্ন কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না।" গদীরে খুমের এই সংক্ষিপ্ত, অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনার পর উপস্থিত সাহাবীদের নিকট হযরত আলীর (রাঃ) গুরুত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং তাঁকে সবাই অভিনন্দন জানায়।

এরপর মহানবী (দঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আলী! হযরত ঈসা মসীহের ব্যাপারে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যা বলেছে, আমি যদি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কিছু লোক কর্তৃক তোমার ব্যাপারে সেই একই কথা বলার আশংকা না করতাম, তাহলে আমি আজ তোমার ব্যাপারে এমন কথা বলতাম যে, এর ফলে তুমি যেখান দিয়ে যেতে, লোকেরা সেখানে তোমার পায়ের তলা থেকে (বরকতের জন্য) মাটি তুলে নিত।" মওলা আলী (রাঃ) সম্পর্কে মহানবী (দঃ) এর উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যে তাঁর অতুলনীয় অবস্থান নির্ধারিত হয়ে আছে। হিজরতের পর মহানবী (দঃ) প্রত্যেক মুহাজির সাহাবীর সঙ্গে একজন আনসার সাহাবীর ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। হযরত আলীকে (রাঃ) মহানবী (দঃ) নিজের সঙ্গে রেখে ঘোষণা দেন, "তুমি তো দুনিয়া এবং আখিরাতে আমারই ভাই।"

৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) উল্লেখ করেন, হযরত আলীর (রাঃ) ফজিলত সম্বন্ধে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সম্ভবত অন্যকোন সাহাবীর ফজিলত সম্পর্কে এতো হাদীস বর্ণিত হয়নি। হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় তাবুকের যুদ্ধে গমনকালে মহানবী (দঃ) সেমা ইবনে আরাফাতকে (রাঃ) নিজের খলিফা নিযুক্ত করেন, আর হযরত আলীকে (রাঃ) আহলে বাইত এবং মহানবীর (দঃ) পরিবার পরিজনদের দেখা শুনা ও প্রয়োজনাদি সমাধা করার জন্য মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। বিষয়টি হযরত আলীর (রাঃ) নিকট অকর্মন্য দায়িত্ব মনে হলে মহানবী (দঃ) ঘোষণা করেন, "তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, হযরত মুসা (আঃ) তুর পর্বতে গমনকালে যেমন নিজের ভাই হযরত হারুনকে (আঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান, তদ্রুপ আমি আমার ভাই আলীকে (রাঃ) আমার খলিফা রূপে রেখে যাচ্ছি। পার্থক্য শুধু এটুকু যে, আমার পরে আর কেউ নবী হবে না।" হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুজুর (দঃ) বলেছেন, "হে পরোয়ার দিগারে আলম! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি মানুষের নিকট একথা পৌঁছে দিয়েছি যে, আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) আমার ভাই এবং চাচাতো ভাই, আমার কন্যার স্বামী এবং আমার ভবিষ্যত বংশধরদের জনক। হে পরোয়ার দিগার। যে ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে, তাকে উপুড় করে দোযখের আগুনে নিক্ষেপ করুন। তবরানী কিতাবে উল্লেখ আছে মহানবী (দঃ) কখনো রাগত হলে হযরত আলী (রাঃ) সম্মুখে গিয়ে কোন বাক্য আরয করা মাত্র হুজুর (দঃ) এর রাগত ভাব উপশম হতো। একই কিতাবে উল্লেখ আছে, মহানবী (দঃ)

উল্লেখ করেছেন, "আলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করাও ইবাদত।" তাবরানী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে উদৃত করে বর্ণনা করেন, "হুজুর (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে (রাঃ) মহবত করেছে, সে আমাকে মহবত করেছে। যে ব্যক্তি আলীর সঙ্গে দুশমনী করেছে, সে আমার সঙ্গে দুশমনী করেছে। বস্তুতঃ আমার দুশমন খোদার দুশমন।" হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে আরো বর্ণনা আছে যে, "মহানবী (দঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলীকে তিরস্কার করেছে, সে আমাকে তিরস্কার করেছে।" হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) এর বর্ণনামতে ইমাম আহমদ এবং হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, "হুজুর (দঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) বলেছেন, দুনিয়াতে দু'ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য, (১) যে ব্যক্তি হযরত সালেহ (আঃ) এর উটনীর পা কেটে ফেলে ছিল এবং (২) হে আলী! যে তোমার মস্তকে তরবারির আঘাত করে তোমার দাড়ি রক্তে রঞ্জিত করে দেবে।" হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন অতুলনীয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, তুলনাহীন বাগ্মী এবং অনলবর্ষী বক্তা। তাঁর সারগর্ভ বক্তব্য এবং প্রাঞ্জল ভাষার মর্মস্পর্শী আহ্বানে ইয়েমেন, ইরাক, পারস্যে তাওহীদের পক্ষে গণ জোয়ারের সূচনা ঘটে।

হিজরতের রাতে মহানবী (দঃ) এর পবিত্র বিছানায় হযরত আলীকে (রাঃ) চাদরাবৃত অবস্থায় শুইয়ে রাখা হয়। হযরত আলী (রাঃ) অবলীলাক্রমে উক্ত নূরানী বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েন। সাধারণত মওলা আলী (রাঃ) সারা রাত আত্মহারা তন্ময়বিষ্ট ইবাদতে উৎফুল্ল থাকতেন। কখনো তন্দ্রাবিভুত হলেও ঘুমাতেন না। কিন্তু সে রাতে হযরত মওলা আলী (রাঃ) গভীর ঘুমে কাটিয়ে দেন। উল্লেখ্য যে, নবীদের বিছানা অত্যন্ত পবিত্র। নবী ছাড়া এ বিছানায় অন্য কারো বসা বা অবস্থান করার অনুমতি থাকেনা। হিজরতের রাতে মওলা আলীকে (রাঃ) মহানবী (দঃ) এর পবিত্র বিছানায় অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশনার সঙ্গে মহান আল্লাহ্‌র পবিত্র আসরার সম্পর্ক যুক্ত ছিল। পৃথিবী থেকে মহানবীর প্রস্থান গ্রহণের পর নবুয়তের সমাপ্তি ঘটবে। নবুয়তের পর হেদায়তের নির্দেশিকা মহান আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী মানব কল্যাণের স্বার্থে অব্যাহত থাকবে। নবুয়ত পরবর্তী মানবগোষ্ঠীর হেদায়ত ধারার নাম হচ্ছে 'বেলায়ত'। মহানবী (দঃ) নবুয়ত ও বেলায়ত উভয় পদ্ধতির একক সত্ত্বাধিকারী ছিলেন। মহানবীর (দঃ) পর যেহেতু অন্যকোন নবী আসবেন না, সেহেতু মানুষের হেদায়ত কর্ম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বেলায়ত ধারা উন্মুক্ত করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। মহানবী (দঃ) হিজরতের রাতে মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশনা মোতাবেক হযরত আলী (রাঃ) সমীপে বেলায়তের দায়িত্ব অর্পণ করেন। মওলায়ী দায়িত্ব অত্যন্ত পবিত্র, স্বভাবজাত ক্ষমাসুন্দর উদারতা এবং সরলতায় পরিপূর্ণ, সর্বোপরি মানুষের জন্য নীতি-নৈতিকতা এবং প্রেম-মমতায় ভরপুর অতি মানবিকতার সোপান। ঐতিহাসিক তাবরানী তাঁর মো'জামে আওসাত নামক কিতাবে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, "হুজুর আকরাম (দঃ) বলেছেন, দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিভিন্ন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। আলী ও আমি একই বৃক্ষ হতে জন্মলাভ করেছি।"

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে মোনাজাতের সময় মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসার পর মহানবী (দঃ) এর প্রতি ছল্লু এবং আম্বিয়া কিরামের প্রতি সালাম পেশ করা হয়। এর পরই হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) এর নামের সঙ্গে 'বাছাফা', হযরত ওমর ফারুকের (রাঃ) নামের পাশে 'আদেল বেরীয়া', হযরত ওসমান যুন্নুরাইন (রাঃ) এর সাথে 'সাহেবে হায়া' এবং মওলা আলীর (রাঃ) নামের সঙ্গে 'মুশকিল কোশা' যুক্ত মর্যাদাময় সম্বোধনে ভূষিত করা হয়।

উল্লেখ্য যে মহানবীর (দঃ) ঘোষিত 'খোলাফায়ে রাশেদীন' হচ্ছে উম্মাহ্‌র ঐক্যের অন্যতম মৌলিক সূত্র। কোন কোন বিষয়ে তাঁদের মধ্যে নির্বিরোধ মতভিন্নতা দেখা গেলেও তা কখনো ধৈর্য তথা সবরের আঙ্গিনা অতিক্রম করেনি। তাঁরা কখনো নিজেদের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করেন নি। তাঁদের চারিত্রিক সৌন্দর্য, পরিমিতিবোধ রুচিশীলতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উদারতা, খোআভীতি, মহানবীর (দঃ) প্রতি আনুগত্য এবং মানবপ্রীতি বিশ্ব সভ্যতা নির্মাণের জন্য অনন্ত দিক নির্দেশনা।

তাসাওউফ ধারার ব্যাপক উত্থান:

সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) বিজয়ী হলেও তা প্রকৃত অর্থে আমীর মোয়াবিয়া ও তাঁর সমর্থকদের কৌশল এবং চাতুর্যের কারণে চূড়ান্ত ফলাফলে পরাজয়ে রূপ নেয়। এই ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে হযরত আলীর (রাঃ) যুদ্ধকালীন সশস্ত্র সমর্থকদের একটি অংশ তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে। পরবর্তী সময়ে এরা খারেজী (দলত্যাগী) সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত হয়। দুমাতুল-জন্দলের সালিসি বৈঠক ছিল মূলতঃ সরলতা-সত্যবাদিতার পরিবর্তে কৌশলগত কপটতা এবং চাতুর্যপূর্ণ মীমাংসা। এই সালিসি বৈঠকের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, আদর্শবোধ, সরলতা, সহনশীলতা, মহানুভবতা, মানবতাবোধ, অঙ্গীকার পালনে দৃঢ়তা এবং সত্যের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যের বিপরীতে কুটীলতা, শঠতা, বিশ্বাসভঙ্গ এবং ফন্দিবাজীর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মহানবী (দঃ) সাহাবীদেরকে সুউচ্চ নৈতিকতা, আদর্শবোধ এবং পারস্পরিক ভালবাসা এবং আস্থা অর্জনের সুবিন্যস্ত প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। হুজুর (দঃ) প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কোন অবস্থায় কুটীলতা, বিশ্বাস ঘাতকতা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং ফন্দি ফিকিরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা আছে, তোমরা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার পূর্ণ করো। কোন চুক্তিপত্র করে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করলে, সে শপথ ভঙ্গ করোনা। "তোমাদের সবকাজ সম্পর্কেই

আল্লাহ্ ওয়াকিবহাল", তোমরা সেই নারীর মতো হয়ো না, যে মজবুত করে সুতো পাকানোর পর নিজেই পাক খুলে নষ্ট করে ফেলে। একদল অন্যদলের ওপর শক্তিমান হওয়ার জন্যে তোমরা তোমাদের শপথ পরস্পরকে প্রতারণার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করোনা। আল্লাহ্ তো এর মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ মহাবিচার দিবসে তোমাদের পারস্পরিক বিরোধের মূল কারণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন।" সূরা আল নহল: ১৬:৯১-৯২)। একই বিষয়ে সতর্ক করে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে, "পরস্পরকে ঠকানোর জন্যে তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করোনা, করলে (বিশ্বাসের মাটিতে) পা দৃঢ় হবার পরিবর্তে পা পিছলে যাবে। আল্লাহ্র পথে বাধা দেয়ার জন্যে তোমাদের অশুভ পরিণতি ভোগ করতে হবে। আর (পরকালে) তোমাদের জন্যে রয়েছে কঠিন আজাব। তোমরা আল্লাহ্র সাথে করা অঙ্গীকার তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করোনা।..." সূরা আন নহল: ১৬:৯৪-৯৫ আয়াতাংশ)। খোলাফায়ে রাশেদীনের শেষ কয়েক বছর যে সকল দুঃখজনক ঘটনা সংঘটিত হয় উপর্যুক্ত আয়াতের তাৎপর্য অনুযায়ী লক্ষ্য করা যায় হযরত আলী (রাঃ) কখনো সুউচ্চ নৈতিকমান এবং অবস্থান থেকে নিজেকে বিন্দু পরিমাণ বিচ্যুত করেননি। সিফ্ফিনের যুদ্ধ এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহে নিজে জড়িত থেকেও তিনি ছিলেন অকপট। প্রখর বুদ্ধিমত্তা এবং প্রতিটি বিষয়ে প্রাজ্ঞ ধারণা প্রদানে সক্ষমতা সত্বেও স্পর্শকাতর বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন থেকেছেন। একই সঙ্গে তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি ছিলেন কোমল এবং দয়াশীল। ৬৬১ খৃস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারী খারেজী আততায়ী আবদুর রহমান ইবনে মুলজামের বিষাক্ত তরবারির আঘাতে শাহাদত বরণের পর তাঁর প্রথম পুত্র আহলে বাইত হযরত হাসান (রাঃ) কুফাবাসীদের দ্বারা খলিফা নির্বাচিত হন। নম্র, কোমল প্রাণ, ধর্মভীরু এবং নির্বিরোধ চরিত্রের অধিকারী হযরত হাসান (রাঃ) কুটনীতি, রক্তপাত, ফন্দি-ফিকিরের ন্যায় অনাদর্শিক কর্মকাণ্ডের প্রতি অনীহ এবং অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। খিলাফত প্রশ্নে উম্মাহর বিভক্তি এবং ব্যাপক রক্তক্ষয়ে নিতান্ত সরলপ্রাণ হযরত হাসান (রাঃ) খুবই ব্যথিত চিত্তে ছয়মাস পর আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে খিলাফতের দাবী আমীর মোয়াবিয়ার অনুকূলে পরিত্যাগ করেন। এর ফলে খোলাফায়ে রাশেদীনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী রাজতন্ত্রের সূত্রপাত ঘটে। খিলাফত পরিত্যাগের পর হযরত হাসান (রাঃ) মূলতঃ বেলায়তের ধারায় উম্মাহ্র নৈতিক পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব পালনে ব্রত হন। অথচ এ ধরনের সুউচ্চ মার্গীয় ধর্মীয় দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় আহলে বাইতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এ সদস্যকে উমাইয়া রাজবংশের ষড়যন্ত্রে বিষ প্রয়োগে শহীদ করা হয়।

খিলাফত পরিত্যাগকালে আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর যে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল তার প্রধান শর্ত ছিল আমীর মোয়াবিয়ার পর হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) উম্মাহ্র খিলাফত পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। আমীর মোয়াবিয়ার সঙ্গে হযরত ইমাম হাসানের (রাঃ) শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হবার পর অনেকে হযরত ইমাম হোসাইনকে আমীর মোয়াবিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের প্রস্তাব দিলে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে উল্লেখ করেন যে, "আমরা আহলে বাইত, নবী (দঃ) পরিবারের পবিত্র সদস্য। আমরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করিনা। সুতরাং খিলাফত দখলের জন্য অস্ত্র ধারণ করা যাবে না।" অথচ পরবর্তী ঘটনাপঞ্জী প্রমাণ করে আমীর মোয়াবিয়া স্বীয় পুত্র ইয়াজিদকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে আহলে বাইতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি অক্ষুন্ন রাখেন নি। এ বিষয়ে হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর অবস্থান জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। সত্য যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন তিনি [ইমাম হোসাইন (রাঃ)] সত্যের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু সত্য যখন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, তখন তিনি অস্ত্র ধারণ করেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে স্বীয় জীবন ধন-সম্পদ ও আত্মীয় স্বজনকে আল্লাহ্র পথে উৎসর্গ করেন। আমীর মোয়াবিয়া কর্তৃক অঙ্গীকার রক্ষার অপারগতার পরিণতি হচ্ছে কারবালার শোকাবহ ঘটনা। কারবালার হিংস্রতা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মুসলমানদের আক্ষরিক বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা, সততা, ন্যায় নিষ্ঠা এবং আদর্শবোধ লালনের ধরন ও মানকে ব্যাপকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। জালিম ইয়াজিদ এবং তার সহযোগিদের নির্মম কর্মকাণ্ডের প্রাণস্পর্শী প্রতিক্রিয়া হয় দ্রুত। সাধারণ মানুষ কারবালা প্রান্তরে শাহাদত বরণকারী ইমাম হোসাইনের (রাঃ) প্রতিটি রক্ত বিন্দু থেকে ইসলাম ধর্মের শ্বাসত উৎসের সন্ধানপ্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ মানব মননে আওয়াজ ওঠে 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় আওর কারবালা কী বাদ' অর্থাৎ কারবালা প্রান্তরে আহলে বাইতের কোরবানীর বিনিময়ে ইসলাম ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। কারবালার ঘটনার পর ইসলাম ধর্ম প্রচারে সিয়াসত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রাধান্যের পরিবর্তে দ্রুত বেলায়তের ধারা প্রাধান্যে চলে আসে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া রাজবংশের একমাত্র হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) ব্যতীত অন্যদের অধার্মিকতা অনৈতিকতা, কপটতা, বিলাসিতা, খিলাফতকে পার্থিব স্বার্থে পুঞ্জীভূতকরণ, ইসলাম ধর্মের সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবর্তে গোত্রীয় প্রাধান্য প্রচলন, মৃগয়া, মদ, নারী এবং দৈহিক রসনা নিবৃত্তির লক্ষ্যে সঙ্গীত ও বাদ্যবাজনার মাধ্যমে আমোদ ফুর্তিতে মদ-মত্ত অনুষ্ঠান এবং কথিত হেরেম প্রথা প্রচলন করে আক্ষরিক অর্থে ইসলাম ধর্মের মূলনীতিকে বিদায় দেয়া হয়। উমাইয়ারা এ সময় নিজেদের অপকর্ম এবং কদর্য স্বভাবকে লোক চক্ষুর অন্তরালে

রাখার লক্ষ্যে এক ধরনের ফন্দি-ফিকির-বাজ, অর্থলোভী তথাকথিত ধর্মীয় আলেমের সৃষ্টি করে। এদের মূলকাজ ছিল শাসকদের অনৈতিক-অপকর্মকে কৌশলে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখা। এ বিষয়ে মহান খলিফা হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) বাণীটি স্মরণযোগ্য। হযরত উমর ফারুকের (রাঃ) বরাতে হযরত মুগীরা ইবনে শে'বা বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম! বনু উমাইয়া ইসলামকে কানা করে দেবে, এরপর অন্ধ করে দেবে...।" উমাইয়া শাসক এবং এর সমর্থকদের ধর্ম বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের নির্বিরোধ প্রতিবাদ হিসেবে এবং ইসলাম ধর্মের মৌলিক কাঠামো সম্পর্কে সত্য ধারণা প্রচারের লক্ষ্যে নোংরা এবং কদর্য রাজনীতির প্রতি অনাগ্রহী সুফিবাদের উত্থান ঘটে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক সময় থেকে সুফি ধারণা পবিত্র কুরআনের সূরা তওবার ১২২নং আয়াতের মর্মানুসারে চালু হয়। কারবালা ঘটনা পরবর্তী সময়ে সত্য ধর্মের অনুসন্ধানকারীরা মানবজাতিকে ধর্ম বিধান সম্পর্কে সুউচ্চ নৈতিক শিক্ষা দানের লক্ষ্যে সুফিবাদকে ধীরে ধীরে প্রাতিষ্ঠানিকতা দান করেন।

তাসাওউফ তথা সুফিবাদের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জনের লক্ষ্যে হযরত ইমাম হোসাইনের (রাঃ) পরিবারের জীবিত একমাত্র পুরুষ সদস্য হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ) (আলী আসগর) এর বক্তব্য এবং সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী অবহিত হওয়া ত্বরিকতপন্থীদের জন্য অত্যাবশ্যক বিষয়। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পর হাওদাবিহীন উটের পিঠে আরোহন করিয়ে উমাইয়া অনুসারীরা হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনকে (রাঃ) ইয়াজিদের নিকট হাজির করে। তখন রাজ প্রাসাদে উপস্থিত একব্যক্তি ইমামকে জিজ্ঞেস করে, হে আলী রহমতের গৃহের অধিবাসী! বলুন আপনার অবস্থা কি? আপনি কেমন আছেন? হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) জবাবে বলেন, "হযরত মুসা (আঃ) এর সম্প্রদায় ফিরাউনের হাতে যে অবস্থায় ছিল, আমার অবস্থাও আমার জাতির হাতে তেমনি। ফিরাউন যেমন ছেলে সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং মেয়ে সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দিত, আমার অবস্থাও সেরূপ।" এ বিপদ ও পরীক্ষার সময় আমি বলতে পারিনা যে, কখন রাত হয় আর কখন দিন আসে। অবশ্য সে অবস্থায়ই আমি আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করছি এবং বিপদে ধৈর্য অবলম্বন করছি।"

একবার উমাইয়া বাদশাহ্ হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান পবিত্র হজ্ব আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। তিনি শাহী নিরাপত্তা নিয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফের পর হাজরে আসওয়াদ চুমো দেয়ার জন্যে অগ্রসর হন। কিন্তু লোকের প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে কোন মতেই হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন নি। বাধ্য হয়ে তিনি মিম্বরে গিয়ে ভীড় কমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে ইমাম হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) তাওয়াফের লক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত হন। তাঁর পরিধানে ছিল পবিত্র পোশাক। দেহ থেকে আতরের সুগন্ধি ছড়িয়ে চারদিক মোহিত করে তুলছিল। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ছিল সূর্যের ন্যায় দীপ্যমান। তিনি তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের জন্য অগ্রসর হন। তাঁকে আসতে দেখে সমস্ত লোক পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন। স্বেচ্ছায় সেখান থেকে তিনি সরে না আসা পর্যন্ত সকল লোক ততক্ষণ পর্যন্ত নিজ নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে অপলক দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

বাদশাহ্ হিশামের সঙ্গে হজ্ব সমাপনের লক্ষ্যে যারা সিরিয়া থেকে আসেন, তাঁরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে হতবাক হয়ে যান। তাঁরা ইমাম জয়নুল আবেদীনকে (রাঃ) চিনতেন না। ফলে তাঁদের একজন বাদশাহ্ হিশামকে জিজ্ঞেস করেন, "এ যুবক কে? তাঁকে এতো সম্মান ও সমাদর কেন? অথচ লোকজন বাদশাহ্ হওয়া সত্ত্বেও আপনার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি। আপনি হলেন বাদশাহ্। আপনার প্রতি কোন প্রকার দৃষ্টি না দিয়ে লোকজন তাঁকে এতো সম্মান করল!"

হজ্ব কাফেলার সঙ্গীর এ ধরনের জিজ্ঞাসাব্যঞ্জক বাক্য হিশামের রাজসিক মেজাজকে আহত করে। এ ধরনের বক্তব্য তিনি নিজের জন্য অপমানজনক ধরে নিয়ে অবজ্ঞা সূরের ঈর্ষান্বিত ভাষায় বলে ওঠেন, "আমি তো অবগত নেই যে, এ ব্যক্তি কে?" হিশামের সভা কবি ফরযদক কথোপকথন সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হিশামের অবজ্ঞা সূচক ঈর্ষান্বিত উক্তি শুনে ফরযদকের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ঈমানী জোশ এসে যায়। তিনি বলেন ওঠেন, আপনি (হিশাম) কি সত্যিই তাঁর পরিচয় জানেন না? তবে আমার নিকট পরিচয় শুনুন। এ বলে তিনি ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রহঃ) প্রশংসায় মুখে মুখে রচনা করে একটি কবিতা শোনান। এ কবিতা নবী (দঃ) এবং তাঁর বংশের প্রতি পরম ভক্তি, ভালবাসা এবং আনুগত্যের পরিচয় বহন করে। ইমামের প্রতি ফরযদকের প্রশংসা সূচক কবিতা শুনে হিশাম ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন এবং নিজের সভা কবিকে আসফান নামক স্থানে গৃহবন্দী করে রাখেন। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাসাওউফ সম্রাটের অভিষেক হয়েছে অতি সাধারণ, বিত্তহীন, শোষিত, দীন-দুঃখী, নির্যাতিত-গরীব-মজলুম মানুষের আনুগত্য লাভ এবং ভালবাসা নিয়ে। শাসকরা অভিষিক্ত হন ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। এখানে আধ্যাত্মিক সম্রাট এবং দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্‌র সম্মান ও মান-মর্যাদার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। (চলবে)

মাইজভাণ্ডারী শরাফতের গাউসিয়াত-কুতুবিয়াতের খেলাফতের ধারাবাকিতার কিছু প্রামাণ্য তথ্য ও শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

• মোঃ মাহবুব উল আলম •

॥ ১ ॥

অধ্যাত্ম জগতে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য: অধ্যাত্ম জগতে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, এই খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে কোনো আধ্যাত্মিক সিলসিলা বহমান থাকে। দুনিয়াবী ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কিম্বা পরিচালকবৃন্দ যেমন তাঁদের মেয়াদ শেষে পরবর্তী উত্তরাধিকারী থাকেন, তেমনি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও আধ্যাত্মিক মসনদে আসীন পুরুষ তাঁর পূরবতী প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করে যান। তবে দুনিয়াবী ক্ষেত্রে মনোনয়ন প্রথার সাথে এর তফাত এই যে, দুনিয়াবী ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জনগণ কিম্বা প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ তাদের মতামত দিয়ে 'নির্বাচন' করার সুযোগ পান। আর আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন 'আধ্যাত্ম কর্তৃপক্ষ' কর্তৃক বহু কঠোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকে মনোনীত করা হয়, যাতে অধ্যাত্মা জগতের পরীক্ষিত সুনাগরিক' ব্যতীত অন্য কারো মতামত প্রকাশের কোন বৈধ অধিকার থাকেনা। আধ্যাত্মিক জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যোগ্যতম শিষ্য বা ছাত্রই তদীয় যোগ্য শিক্ষক কর্তৃক বিজ্ঞতাসহকারে নির্ভুলভাবে মনোনীত হন। নবুয়তের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সীমাহীন কঠোর পরিশ্রম, সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিতর্কাতীতভাবে যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই নবুয়তের গুরুভার ও দায়িত্ব অর্পণ করেছেন মহান রাব্বুল আলমীন। আধ্যাত্মিক দায়িত্বভারও কল্পনাতীতভাবে গুরু ও কঠিন। এখানেও দায়িত্ব পান যথাযথ যোগ্য ও পরীক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দ।

॥ ২॥

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খিলাফতপ্রাপ্তির তথ্য : অধ্যাত্ম খিলাফতের গুরুভার ও দায়িত্ব যে প্রকৃত যথাযথ যোগ্য ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুরুষের হাতেই অর্পিত হয়, মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার প্রতি দৃষ্টি দিলে তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে প্রথমেই মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম শরাফতের প্রাণপুরুষ হযরত গাউসুল আযম শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ)-এর অধ্যাত্ম খিলাফত প্রাপ্তির ইতিহাসের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাক। মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক শরাফতের প্রমাণ তথ্য সমৃদ্ধ দলিল প্রণেতা অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তদীয় বিখ্যাত গ্রন্থ "হযরত গাউসুল আযম শাহ্সুফি মৌলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থের শেষ কভার পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তাতে লিখেছেনঃ "দেশীয় শিক্ষা সমাপনান্তে উচ্চ শিক্ষার্থে তিনি (হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী) হিজরী ১২৬০ সনে কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং অধ্যয়ন শেষে ১২৬৯ হিজরী সনে যশোহরে কাজীর পদ গ্রহণ করেন। পরবতী বছরেই কাজীর পদ ত্যাগ করে কলিকাতায় মুন্সী বো-আলী মাদ্রাসায় প্রধান মোদার্‌রিস হিসাবে শিক্ষকতা শুরু করেন। ইতোমধ্যে পীরানে পীর গাউসুল আযম হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (কঃ) বংশধর ও কাদেরিয়া ত্বরিকার খেলাফতপ্রাপ্ত গাউসে কাওনাইন শেখ সৈয়দ আবু শাহ্মা মোহাম্মদ সালেহ কাদেরী লাহোরী ও তাঁর অগ্রজ চিরকুমার শাহ্ সৈয়দ দেলওয়ার আলী পাকবাজ এর সংস্পর্শে এসে ফয়েজ ও কামালিয়াত অর্জন করেন। পীরের নির্দেশে স্বগ্রামে ফিরে এলে খোদাদাদ অপূর্ব গুণ জ্ঞানের মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে লোকজন ছুটে আসে।"---

এই গ্রন্থে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ)-এর খেলাফতপ্রাপ্তি সম্পর্কে লিখিত হয়েছে : "হযরত আবু শাহ্মা ছাহেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হে প্রিয়তম! আমার বাবুর্চিখানায় আপনার জন্য যাহা সুরক্ষিত ছিল, তাহা আনীত হইয়াছে। আরো অধিক প্রয়োজনে আপনি স্ব-হস্তে পাকাইয়া খাইবেন।" পুস্তকে 'কামেলিয়াত অর্জন' শীর্ষক অংশে লিখিত হয়েছে; "ত্রিমুখী প্রবাহী চতুর্বিধ ধারাবাহী বাগদাদী সাগরের সংমিশ্রণে মহাপ্রশান্ত সাগর সৃজিত হইল।"

অতএব, সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হযরত সাহেব কেবলা (কঃ) বড়পীর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (রঃ) কাদেরিয়া সিলসিলায় তদীয় আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে সরাসরি খেলাফতপ্রাপ্ত অলিয়ে কামেল।

॥ ৩॥

হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) খেলাফতপ্রাপ্তির তথ্য: এবার মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার দ্বিতীয় ঝাণ্ডাবরদার গাউসুল আশেকীন হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা

ভাণ্ডারীর (কঃ) আধ্যাত্মিক অধিষ্ঠান ও খেলাফত লাভের বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাক। এ ব্যাপারে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) উত্তরাধিকারী মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা মাইজভাণ্ডারী বিরচিত 'অলীকুল শিরোমনি হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ)' শীর্ষক প্রামাণ্য গ্রন্থে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) খেলাফত লাভ করেছেন তাঁর জেঠা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্‌সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ)-এর নিকট থেকে। এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে (কঃ) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) স্থলাভিষিক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) কাছে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষার পরীক্ষা দেবার পর তিনি খেলাফত ও কামেলিয়াত হাসিল করেন। এ সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকের "ছাত্র জীবন, আদর্শ চরিত্র ও খেলাফত লাভ" অধ্যায়ের উপসংহারে লিখিত হয়েছে "... অসাধারণ সাধনা, ধৈর্য্য ও প্রতীক্ষার শেষে তাহার (হযরত বাবা ভাণ্ডারীর) সেই শুভমুহূর্ত আসিল; তখন তিনি স্বীয় মোরশেদ গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কেবলার সোহবতপ্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করতঃ আধ্যাত্ম জগতের সম্রাট হইয়া বসিলেন।" অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর রচিত হযরত কেবলা কাবার জীবনী ও কেরামত গ্রন্থেও হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক হযরত কেবলার কাছ থেকে খেলাফত ও ফয়েজ লাভের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

॥ ৪ ॥

হযরত শাহ্‌সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খিলাফতপ্রাপ্তির তথ্য : এবার অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খিলাফত বিষয়ক প্রামাণ্য তথ্যাবলী খতিয়ে দেখা যাক। প্রথমে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর দৃষ্টি দেওয়া যাক, যা প্রকাশ্যে ঘটেছে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে। সাবেক নোয়াখালীর সেনাবাগের শ্রীপুরের হযরত মওলানা এয়াকুব গাজী (রঃ) হযরত আকদাসের বেলায়েতপ্রাপ্ত প্রধান খলিফাদের অন্যতম। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত গ্রন্থের উনবিংশ পরিচ্ছেদে মুদ্রিত তালিকার ২৭ নম্বরে তাঁর নাম লিপিবদ্ধ আছে। হযরত এয়াকুব গাজী (রঃ) তাঁর প্রথম মুর্শিদ জৈনপুরের পীর সাহেব কর্তৃক সরাসরি আদিষ্ট হয়ে যখন মাইজভাণ্ডার শরিফে হযরত আকদসের নিকট আসেন, তখন এক পর্যায়ে তাঁকে শরবত পান করান হযরত আকদাসেরই নির্দেশে হযরতের প্রিয় 'দেলা ময়না' কিশোর হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

এই ঘটনাসহ আরো অনেক ঘটনা রয়েছে, যেগুলোতে দেখা যায়, হযরত আকদাস তাঁর জীবদ্দশাতেই কিশোর হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে (কঃ) দিয়ে জাহেরীভাবে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্ব করাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে কুমিল্লার নবাব হোচ্ছামুল হায়দারের নায়েবের প্রতি হযরত আকদাসের উচ্চারণ ঃ- "নবাব হামারা দেলা ময়না হ্যয়; ফের আওর কোওন নবাব হ্যায়" বাঁশখালীর জনৈক সুলতান আহমদের প্রতি উচ্চারণ ঃ- "তোম্ কোওন সুলতান হ্যায়; সুলতান হামারা দেলা ময়না হ্যায়।" প্রভৃতি লক্ষ্যণীয়। এছাড়া কিশোর দেলা ময়নার কচি কণ্ঠে মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী (রঃ) বিরচিত "গাউসে মাইজভাণ্ডার মুঝে শরবত পিলা দো"– শেয়ার শুনে সস্নেহে তাকে পর্যায়ক্রমে শরবত পান করানোর ঘটনাও গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটি, তা হলো হযরত আকদাস কর্তৃক হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) বড় ভাই মীর হাসান মিঞাকে জীবদ্দশাতে 'নাবালেগ' বলে উল্লেখ করে দেলা ময়নাকে 'বালেগ' বলে নির্দেশ করে এই উচ্চারণ : "আমার দেলা ময়না বালেগ। দেলা ময়নাই আমার গদীতে বসিবেন।" অতএব, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে প্রকাশ্যে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর গাউসিয়তের খিলাফত অর্পণের বিষয় এসব তথ্যে সপ্রমাণিত।

হযরত শাহ্‌সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) স্বীয় সাংসারিক জীবনে কুতুবুল আকতাব হযরত বাবা ভাণ্ডারী শাহ্‌সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান কেবলা কাবার (কঃ) কন্যা সৈয়দা সাজেদা খাতুনের জামাতা। হযরত আকদাসের মনোনীত খলিফা বা প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারীকে স্বীয় আত্মজার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে নিজের বুকে ধরে রাখলেন তাঁর যুগপৎ প্রথম ও প্রধান খলিফা এবং স্থলাভিষিক্ত হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবা (কঃ)। এই বৈবাহিক সম্বন্ধকে সাধারণ সম্বন্ধ বলার উপায় নেই। এর মধ্যে আধ্যাত্মিক যোগ-বিয়োগ সক্রিয় এবং আধ্যাত্মিক জগতে পরিকল্পিতভাবেই এ ধরণের ঘটনা ঘটে থাকে। হযরত বাবা ভাণ্ডারী (কঃ) স্বীয় পবিত্র মহাসম্পদ কুতুবিয়তের দায়িত্বভারও এক পর্যায়ে তাঁর পুত্রবৎ অছি-এ-গাউসুল আযমের উপর অর্পণ করেন বলে বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ আছে।

॥ ৫ ॥

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খিলাফতপ্রাপ্তির তথ্য: এবার শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খিলাফত ও আধ্যাতিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত তথ্যাদি বিন্যস্ত করে দেখা যাক। হযরত সৈয়দ জিয়াউল মাইজভাণ্ডারী (কঃ) হলেন কুতুবুল আকতাব হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) দৌহিত্র। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর

গুরুতর মাতৃরোগে আক্রান্ত হয়ে শিশু শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) পূর্ণ নিথর হয়ে যাবার পর হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) পবিত্র হস্ত নিঃসৃত পানির বদৌলতে পুনঃজীবন প্রাপ্ত হন। এখান থেকেই শুরু। অতঃপর তিনি হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) বিখ্যাত 'সিনায় সিনায়' লেখাপড়ায় সমৃদ্ধ। প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক দীক্ষার সূত্রপাত এখান থেকেই। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী পৈতৃক সূত্রে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) প্রপৌত্র। রিয়াজতের সময় মারেফতী জালালিয়াতের অনলে স্বর্ণের মতো দগ্ধ হয়ে তিনি যখন পরিশুদ্ধ হচ্ছিলেন, তখন উদ্বিগ্ন পিতা অছি-এ-গাউসুল হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে (কঃ) স্বীয় একাধিক খাদেমের প্রতি স্বপ্নাদেশ মারফত জানান যে, তিনি "জিয়াউল হককে সবার জন্য বাতি জ্বালাচ্ছেন।" এছাড়া হযরত আকদাস স্বপ্নযোগে তাঁর অছি হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে (কঃ) নির্দেশ দেন : জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাকে অর্পণ করুন।" এসব তথ্য অছি-এ- গাউসুল আযম জনসমক্ষে প্রকাশ্যেই প্রকাশ করে গেছেন এবং সেগুলো শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) পিতৃ-মাতৃ উভয় সূত্রে মাইজভাণ্ডারী শরাফতের মারাজাল বাহরাইন"। গাউসিয়ত-কুতুবিয়ত দুটোরই ধারক তিনি।

সাধনার সুকঠিন পর্যায় শেষে জালালিয়াতের অগ্নিসেতু পার হয়ে যখন তিনি জালালিয়াতের স্বর্গোদ্যানে পৌঁছলেন, তখন হযরত আকদাসের নির্দেশনা মতে অছি-এ-গাউসুল আযম "জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাঁকে অর্পণ করার" আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ৯ মাঘ হযরত আকদাসের পবিত্র উরস্ শরিফের একদিন পূর্বে অগণিত মানুষের উপস্থিতিতে গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াতের মহান আমানত তথা খিলাফত তাঁর উপর অর্পিত হয়। এই প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অছি-এ-গাউসুল আযম নিজে পরিধান করেন হযরত আকদাসের 'হলুদ' রঙের চাদর এবং পুত্র হযরত জিয়াউল হকের (কঃ) গায়ে পরিয়ে দেন 'টিয়া' রঙের চাদর। খিলাফতের উত্তরাধিকারীকে মুখোমুখী সামনে বসিয়ে পিতা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী বললেন ঃ "হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) যে পবিত্র আমানত আমার হেফাজতে ছিল, তা আজ আপনাকে অর্পণ করছি; হেফাজত করবেন।" একথা বলেই তিনি হযরত আকদাসের টিয়া রঙের চাদর মোবারকটি 'খিলাফত হস্তান্তরের' নিদর্শনস্বরূপ পুত্র হযরত জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) গায়ে চড়িয়ে দেন। প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে গাউসিয়াত-কুতুবিয়াতের খিলাফত হস্তান্তরের এমন ঘটনা আধ্যাত্ম ইতিহাসে বিরল বটে।

এখানেই শেষ নয়। ১৯৭৪ খৃস্টাব্দের ৬ এপ্রিল অর্থাৎ হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা কাবার উরস্ শরিফের পরদিন অছি-এ-গাউসুল আযম সমাগত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, বৈশাখের এক তারিখ থেকে একটা নূতন যুগের সৃষ্টি হচ্ছে। আমি খেদমতের জিম্মাদারী ছেড়ে দেবো।" উল্লেখ্য, হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) উরস্ শরিফ হয় ২২ চৈত্র। হযরত আকদাসের উরস্ শরিফের প্রাক্কালে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত হস্তান্তর এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (কঃ) উরস্ শরিফের পরদিন প্রকাশ্যে এমন উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম ও কথা-বার্তার মাধ্যমে নয়, লিখিতভাবেও এই খেলাফত হস্তান্তরের দলিল রেখে গেছেন অছি-এ-গাউসুল আযম। 'জরুরী বিজ্ঞপ্তি' শিরোনামে মুদ্রিত এক প্রচারপত্রে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) খেলাফত প্রাপ্তির বিষয়টা প্রতীয়মান হয়। এ বিজ্ঞপ্তির শুরুতে লিখা হয় "উরসে পাকে গাউসে আযম শাহে মাইজভাণ্ডার কা/আশোকু কো শওকছে তাশরিফ লানা চাহিয়ে"। এই শেয়রের পর লিখা হয় ঃ "অত্র বিজ্ঞপ্তি মূলে অবগত করিতেছি যে; আসছে ১০ মাঘ রোজ শুক্রবার ১৩৮১ বাংলা মোতাবেক ২৪ জানুয়ারী সাবেক পদ্ধতিতে গাউসে পাকের পবিত্র স্মৃতি বার্ষিকী উরস্ শরিফ হযরত আকদাসের মাজার শরিফের পাশে-হুজরা শরিফ গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিলের সামনে অনুষ্ঠিত হইবে। "কামেলের মাজার জান সর্বদুঃখহারী/প্রেমিকের প্রাণে ঢালে শান্তি সুধা বারি।" অতঃপর বঙ্গানুবাদসহকারে কবি হাফিজের একটি শেয়র উদ্ধৃত করার পরবর্তী পঞ্চম অনুচ্ছেদে লিখা হয়ঃ "প্রথম পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে তাঁহার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মসজিদ পুকুরের উত্তর দিকের আমার নিজস্ব বাগান বাড়ীতে পাকা-দালান, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া এবং তাঁহার প্রাপ্য জমি-জমা তুল্যাংশে ভাগ-বণ্টন মতে দিয়া পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি। এখন তিনি নিজের অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।"

বিজ্ঞপ্তি শেষে স্বাক্ষরাংশে রয়েছে 'খাদেমুল ফোকরা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।'

এই লিখিত বিজ্ঞপ্তি শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক গাউসিয়ত-কুতুবিয়াত খেলাফত প্রাপ্তির সংশয়াতীত প্রমাণ। সংক্ষেপে বলা যায়; শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী স্বয়ং এক স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট উজ্জ্বল সূর্য, অন্যের আলোয় আলোকিত চন্দ্র। উল্লেখ্য, হযরত আকদাসের স্বপ্নাদেশমূলে তাঁর নাম রাখা হয় 'জিয়াউল হক' বা "সত্যের আলো।" অছি-এ-গাউসুল আযম তাঁর বড় মিঞাকে যথাযথ অবস্থানে সংস্থাপিত করার দায়িত্ব পালন শেষে সর্বোচ্চ পর্যায়ের চারিত্রিক সনদরূপে প্রকাশ্যে

উক্তি করেনঃ "বড় মিঞা বেগুনাহ!" বলা বাহুল্য, গাউসিয়ত-কুতুবিয়াতের শক্তি ধারণ ও দায়িত্ব পালনের জন্য তথা খেলাফতের কর্তব্য পালনের জন্য মনোনীত পুরুষকে অবশ্যই "বেগুনাহ" হতে হয়।

॥ ৬ ॥

হযরত শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) উত্তরাধিকার: হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্সুফি সৈয়দ আহমদউল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কেবলা কাবার অব্যর্থ উক্তি : রোজ কেয়ামত পর্যন্ত মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে ওলী আল্লাহর জন্ম হবে। গাউসিয়ত ও কুতুবিয়াত এই মহান দরবারে সক্রিয় থাকবে এবং পর্যায়ক্রমে যোগ্য হাতে তা পবিত্র আমানত হিসেবে গচ্ছিত থাকবে। এ নিবন্ধের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে সন্নিবেশিত তথ্যাবলী এ সত্যেরই প্রমাণ।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) কাছে তদীয় পিতা ও মুর্শিদ হযরত হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর মুর্শিদ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) যে আমানত হস্তান্তর করেছিলেন, গাউসিয়াত-কুতুবিয়াতের সেই মহান আমানত এখন কার জিম্মায় আছে; তা জানবার জন্যে লক্ষ লক্ষ আশেকে মাইজভাণ্ডারীর কৌতুহলের অন্ত নেই।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গাউসিয়া হক মন্‌জিলে সমাসীন হবার পূর্বেই হযরত আকদাসের পবিত্র রওজা মোবারকের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেনঃ "হেলিওনা, দুলিও না থাকিও সাবধানে /প্রেমতরী বাঁধা আছে গাউস ধনের পাক চরণে।" এই গাউসিয়া হক মন্‌জিলে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে মাইজভাণ্ডার শরাফতের এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) কর্তৃক ধারণকৃত ও পরিবাহিত গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াতের বর্তমান অবস্থিতিস্থল সম্পর্কে কতিপয় তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করা গেল।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গাউসিয়াত-কুতুবিয়াতের খিলাফত ও আমানতদারী প্রাপ্তির দুই দশকেরো বেশীকাল ধরে এবং আরো রিয়াজতকালীন সময়ে প্রতি ২৪ ঘণ্টার দিবা-রাত্রির মেয়াদে সর্বদা দিক-বিদিক ছুটেছেন। এ ছুটা বিরামহীন আধ্যাত্মিক ঝটিকা সফর। এসব সফরের কোনটাতেই তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারী হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীকে (মঃ জিঃ আঃ) একদিনের জন্যও সফরসঙ্গী করেননি। নিয়েছিলেন মাত্র একবার এবং তা-ও তাঁর জীবনের আখেরী দিনের আখেরী সফরে ১৯৮৮ সনের ১২ অক্টোবর, যেদিন তিনি চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতাল থেকে কক্সবাজারে ঝটিকা সফরে যান ও সেদিনই ফিরে আসেন।

শাহজাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে (মঃ জিঃ আঃ) সঙ্গী করে জীবনের শেষ দিবসে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) এই সফরের বিবরণ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে ঐ সফরের অন্যতম সঙ্গী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের তদানীন্তন পদস্থ কর্মকর্তা জনাব গোলাম রসুল কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় রচিত "The Divine Spark" (১৯৯৪), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এককালীন সচিব শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর একান্ত অনুরাগী ভক্ত সৈয়দ মোহাম্মদ আমিরুল ইসলাম বিসিএস কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় বিরচিত "Shahanshah Ziaul Huq Maizbhandari" শীর্ষক গ্রন্থ, গাউসিয়া হক মন্‌জিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব জামাল আহমদ সিকদার বিরচিত সুবিখ্যাত "শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী" গ্রন্থসহ বিভিন্ন নিবন্ধে। জনাব গোলাম রসুল ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের অনেক পদস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তা, শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর একান্ত ঘনিষ্ঠজন ও গাউসিয়া হক মন্‌জিল কমিটির জন্মলগ্ন থেকে আমৃত্যু সভাপতি হযরত সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ সহ হাজার হাজার বিজ্ঞ ভক্ত-আশেক এই মহান অলি আল্লাহ্‌র জীবনের শেষ দিবসের রহস্যময় ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী। এসব বিবরণ ও অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে নিম্নরূপঃ-

১৯৮৮ খৃস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বুধবার। চিকিৎসক ও ভক্ত অনুরাগীদের সকল বাধা, অনুরোধ, আবেদন উপেক্ষা করে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তান হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারীকে (মঃ জিঃ আঃ) সঙ্গে নিয়ে কক্সবাজার সফরে রওনা হন। সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে জনাব গোলাম রসুল, জহিরুল হক, আবদুল মতিন চৌধুরী, আবদুল মন্নান, মোহাম্মদ বিল্লাহ প্রমুখ ছিলেন। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর পাশে বসিয়েছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে। কক্সবাজারে কোথাও তিনি গাড়ী থেকে নামেননি। ফেরার পথে চকরিয়া অতিক্রম করার সময় দৃশ্যতঃ সংজ্ঞাহীন হয়ে তাঁর প্রিয় 'হাসান মিঞার' কোলে ঢলে পড়েন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)। কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান গাড়ীতে ডুকরে কেঁদে উঠেন। মহান পিতার কাছে আর্জি জানান, আরো কিছুকাল তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য। তিনি এই ফরিয়াদ করেন দু'বার। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) শাহাদাত আঙ্গুল তুলে পুত্রের দৃষ্টি উপরের দিকে আকর্ষণ করলেন এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল (নির্ভর) করার উপদেশ দিলেন। চট্টগ্রাম মহানগরীতে ফিরে আসার পর আবার তাঁকে বন্দর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। উল্লেখ্য, এর কয়েক দিন পূর্বে বন্দর হাসপাতালে চিকিৎসার সময় ডাক্তারী পরীক্ষাকালে তাঁর

হৃদপিন্ড নিশ্চল, নাড়ী নিস্পন্দ এবং রক্তচাপ শূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। এ অবস্থায় কোন মানুষ সাধারণতঃ বেঁচে থাকবার কথা নয়। অথচ শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) এই অবস্থায়ও সক্রিয়ভাবে বেঁচে ছিলেন। চিকিৎসকরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতার কথা সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করেন এবং নিজেদের নিবন্ধাদিতে তা লিপিবদ্ধ করেন। ১২ অক্টোবর (১৯৮৮) রাত বারোটা বাজার বিশ মিনিট পূর্বে বাম হাতে একটা হাত ঘড়ি ধরে তিনি বলেন, "আমার সময় শেষ। আমি চলে যাচ্ছি।" চিকিৎসার সব সরঞ্জাম খুলে ফেলার পরামর্শ দেন ডাক্তারদেরকে। নিজে "আল্লাহু-আল্লাহ্-আল্লাহ্" জিকির করতে বললেন। উপস্থিত প্রায় দশ হাজার ব্যথাতুর ভক্তের বুকফাটা জিকিরের ধ্বনিতে গোটা বন্দর এলাকা মুখরিত হতে থাকে এবং জিকির করতে করতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ সময়ও হাসপাতালের ঐ কক্ষে তাঁর সাথে ছিলেন পুত্র কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান এবং পত্নী হযরত সৈয়দা মনোয়ারা বেগম।

জীবনের অন্তিম সময়ে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তদানীন্তন বন্দর কর্মকর্তা আলী নবী চৌধুরীর পোর্ট ট্রাস্টের বাসায় একটা কক্ষে দরোজা বন্ধ করে কিশোর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে নিয়ে বসেন। এ সময়ে তাঁদের দু'জনের মধ্যে কি কথাবার্তা বা বিনিময় হয়, তা তাঁরা দুজন ব্যতীত অন্য কেউ অবগত নন বলে এসব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা লিখে গেছেন। অতঃপর দরোজা খোলার পর আলী নবী চৌধুরী একই ট্রেতে করে পিতা-পুত্র দুজনের জন্য চা ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পেশ করলেন। তা দেখে শাহানশাহ্ হুজুর বললেন, "আমার হাসান মিয়া অলি আল্লাহ্। আমার খাদ্যদ্রব্যের সাথে তাঁর জন্যও খাদ্যদ্রব্য দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে তাঁর জন্য পৃথক ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারে তাঁর চা ও খাবার দিন।" গৃহকর্তা এই পরামর্শ তামিল করলেন। এর আগেও অনেকবার শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ) প্রকাশ্যে বলেছেনঃ "আমার হাসান মিঞা আল্লাহ্র অলি। তিনি দু'বার আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমার শরীরে ইলেকট্রিকের তার জড়িয়ে যায়। হাসান মিঞা সেগুলো সরিয়ে দেন। আমি বেঁচে যাই।" এ ধরনের বহু ইঙ্গিতময় কাজ ও উক্তি রয়েছে শাহজাদা সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (মঃ জিঃ আঃ) সম্পর্কে। এসব উক্তি ও কাজ সংঘটিত হয় প্রকাশ্যে, দিবালোকে। এ প্রসঙ্গে জনাব জামাল আহমদ সিকদার প্রণীত "শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী" শীর্ষক জীবনী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মহান অলি-আল্লাহ্দের কোন কাজ ও কথা অবশ্যই অর্থহীন ও অনর্থক নয়। জীবনের অন্তিম দিবসে ভোরে কক্সবাজার যাবার প্রাক্কালে শাহানশাহ্ হুজুর সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে চেয়ারে অধিষ্ঠিত করে নিজ হাতে তাঁর মুখে তবরুক তুলে দেন। এসব তথ্য এ সত্যেরই সাক্ষ্য দেয় যে, শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) তাঁর কাছে গচ্ছিত সকল আধ্যাত্মিক আমানত শাহজাদা হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (মঃ জিঃ আঃ)-এর কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন।

সুফি উদ্ধৃতি

- আউলিয়াদের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপেক্ষা কঠিন কোন কাজ নেই।
- স্বাদে তৃপ্তি আর চেষ্টায় বিশ্বাস এ দু'টোকে ত্যাগ করতে পারলেই দাসত্বের হক আদায় হয়।
- নিজেকে নিয়ামতের অনুপযুক্ত বলে ধারণা করাই শোকর বা কৃতজ্ঞতা।
- যে স্থানে মিথ্যা না বললে রক্ষা পাওয়া মুশকিল সে স্থানেও মিথ্যা না বলা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠা।
- প্রকৃত ফকীরের লক্ষণ হল সে কারও কাছে কিছু চায় না, কারও সাথে ঝগড়া করে না, কেউ ঝগড়া করতে চাইলেও চুপ করে থাকে।
- ধৈর্য্য মানুষকে বিনা প্রার্থনায় ও বিনা মিনতিতে আল্লাহর সাথে লিপ্ত রাখে।
- রুজী-রোজগার উপার্জন না করার নামও তাওয়াক্কুল।
- দোজাহানের কারও চেয়ে নিজেকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মনে না করা, আর একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হওয়াই হল নম্রতা বা বিনয়।

–হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ)

কর্ম ও মর্মের আলোকে
শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) [১৯২৮-১৯৮৮]

• ড. সেলিম জাহাঙ্গীর •

পিতার জীবদ্দশায় যিনি স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর হয়ে স্বতন্ত্র মন্‌জিলের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তদীয় পিতার সহানুভূতিপূর্ণ আধ্যাত্মিক স্বীকৃতিলাভে সমর্থ হয়েছিলেন তিনি শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী।

তিনি ছিলেন গাউসুলআযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর (১৮২৬-১৯০৬) প্রপৌত্র, হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর (১৮৬৫-১৯৩৭) দৌহিত্র এবং হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (কঃ) মাইজভাণ্ডারীর (১৮৯৩-১৯৮২) প্রথম পুত্র।

জন্ম: ১০ পৌষ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ১২ রজব, ১৩৪৭ হিজরী, ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দ মঙ্গলবার প্রত্যুষে।

শিক্ষা: মাইজভাণ্ডার আহ্‌মদিয়া জুনিয়র মাদ্‌রাসা, আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল। কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজ, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯৪৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস। অতঃপর চট্টগ্রাম সরকারি কলেজে ভর্তি। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে পাস করে কানুন্‌গোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে এসে বি.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। যথারীতি সারা বছর লেখাপড়ার পর বি.এ. টেস্ট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। ১৯৫৩ সাল- বি.এ. টেস্ট পরীক্ষার তৃতীয়দিন ছাত্র সৈয়দ জিয়াউল হক পরীক্ষার হলে আনমনা হয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন এবং কোন লেখা ছাড়াই সাদাখাতা জমা দিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসেন। রহস্যময় এইরূপ আচরণের মধ্যদিয়ে তাঁর জাগতিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই পরিসমাপ্তি।

অতঃপর সৃষ্টির অনন্তরহস্য সন্ধানে দুর্গমপথের অভিযাত্রী সাধক জিয়াউল হক কানুন্‌গোপাড়া থেকে সোজা মাইজভাণ্ডার শরিফ চলে আসেন। বাড়িতে আসার পর প্রথমে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে দিন কাটাতেন। খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে যেতেন। মাঝে মধ্যে ভাব-বিভোর অবস্থা (হালজজব) চরমে পৌঁছত। এমতাবস্থায় একদিন তাঁর মা চুন্নুমিয়া শাহ্ সাহেবকে ছেলের এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে শাহ্‌সাহেব বলেন, "বড়মিয়াকে একটা ঘরে পাক-পবিত্র অবস্থায় রাখবেন এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবেন।" মা এতে স্বীয় পুত্রের আধ্যাত্মিকতার শুভসূচনার ইংগিত পেলেন।

বায়াতের দীক্ষা: এই সময় সৈয়দ জিয়াউল হক অনেকবার স্বীয়পিতার নিকট বায়াতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় একদিন পিতার তত্ত্বাবধানে চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লাস্থ শাহী জামে মসজিদের তদানীন্তন খতিব ফৌজদারহাট নিবাসী হযরত মাওলানা ছফিরুর রহমান হাশেমীর হাতে বায়াতের দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর সুনজরে: সৈয়দ জিয়াউল হক বি.এ. পরীক্ষা দেওয়ার সময় হযরত কেবলার (কঃ) আধ্যাত্মিক সুনজরে পড়েন। প্রেরণাধিক্যে ক্রমান্বয়ে তিনি আহার নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ করেন। এতে তাঁর পিতা রীতিমতো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বড় সন্তানের এই অবস্থা অথচ কোনো ঔষুধ খুঁজে পাচ্ছেন না। এক রাতে তিনি চিন্তিত অবস্থায় বিশ্রাম করছেন হঠাৎ দেখতে পেলেন হযরত কেবলা (শাহ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী) তাঁর নিকট এসে বলছেন, "আপনি উদগ্রীব হয়েছেন কেন? আমার জুব্বাটি তাঁর গায়ের উপর ঢেলে দিন।" এমতদর্শনে তিনি তাড়াতাড়ি হযরতের স্মৃতি কামরা থেকে জুব্বাটি তালাশ করে এটি ছেলের গায়ের উপর ঢেলে দেন। সেদিন হতে দেখা গেল, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও শান্ত হয়ে ওঠেছেন।

রিয়াজত: জৈবিকপ্রেরণাজাত সকলপ্রকার চাহিদা ও অক্ষমতা নির্মূল করার লক্ষ্যে সৈয়দ জিয়াউল হক (কঃ) কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। পৌষের কন্‌কনে শীত। ঠান্ডায় মানুষ লেপ-কাঁথার ভিতরেও টিকতে পারেনা, পৌষ-মাঘের এমনি শীতে অন্দর বাড়ির পুকুরে ঘন্টার পর ঘন্টা, কখনো একটানা দুইদিনও পানিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকতেন। বাড়ির পশ্চিমে লোহার খালেও কখনো কখনো নাক দেখিয়ে ডুবে থেকে সময় কাটিয়েছেন। অত্যধিক ঠান্ডায় শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যেতো, পর পর কয়েকটি শীত-ঋতু তিনি এমনি কষ্টকর-সাধনায় কাটিয়েছেন।

তিনি কখনো কখনো ৩/৪ দিন পর্যন্ত অনাহারে থাকতেন। কখনো একপায়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকতেন। একবার নিজকক্ষে দরজা জানালা বন্ধ করে দীর্ঘ আঠার দিন অনাহারে কাটিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সাল থেকে ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর কখনো একটা পুরো রাত ঘুমে কাটাননি। পাহাড়-পর্বত, শহর-নগরের সর্বত্র ভ্রমণ করেছেন অনির্দিষ্ট এবং অনির্ধারিতভাবে।

বৈবাহিক জীবন: ফটিকছড়ি উপজেলার দাঁতমারা ইউনিয়নের বিশিষ্ট জমিদার জনাব বদরুজ্জামান চৌধুরী (প্রকাশ 'বদন সিকদার') সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ সৈয়দা মুনওয়ারা বেগম এর সাথে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি, মঙ্গলবার বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

পিতা অছি-এ-গাউসুল আযম থেকে খেলাফত প্রাপ্তি:

সময়কাল ১৬ জানুয়ারি ১৯৬৬, মাঘ মাসের ২ তারিখ। গাউসুল আযম শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী স্বপ্নে সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে বলেন 'জিয়াউল হক মিঞার আমানত তাঁকে অর্পন করুন।' তৎপ্রেক্ষিতে ১০ মাঘের ওরশের পূর্বদিন সকাল ১১টায় রওজা পাক গোসল শরিফের পর সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী স্বপ্নাদেশ মতে রওজা শরিফের স্মৃতিকক্ষ থেকে হলুদ ও খয়েরী রংয়ের দুখানা চাদর আনিয়ে গাউসে পাকের পবিত্র গদী শরিফে বসে হলুদ রংয়ের চাদরটা নিজ গায়ে জড়িয়ে পুত্রকে সামনে বসিয়ে গুরু গম্ভীর স্বরে বলেন, 'হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) যে পবিত্র আমানত আমার হেফাজতে ছিল তা আজ আপনাকে অর্পণ করছি, হেফাজত করবেন।' এ কথা বলে খয়েরী রংয়ের চাদরখানা নিজহাতে ছেলের গায়ে পরিয়ে দেন। ছেলে জিয়াউল হক মিঞার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় 'আলহামদুলিল্লাহ্'।

পিতার নিকট থেকে আনুষ্ঠানিক খেলাফত লাভ করে গাউসুলআযম মাইজভাণ্ডারীর পবিত্র হুজরায় শুরু হয় তাঁর বায়াতের (আধ্যাত্মিক দীক্ষা) কাজ। প্রথম দিনেই কয়েকশত লোক বায়াত গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে আসার পর ক্রমে তা কমে আসে। এ মন্‌জিলে আসার পর আনুষ্ঠানিক বায়াত গ্রহণ করেন মাত্র জনা পঞ্চাশেক এবং ১৯৭৮ সালে এসে আনুষ্ঠানিক বায়াত প্রথাই বন্ধ করে দেন।

তাঁর বায়াতের বিশেষত্ব: একই দোয়া দরূদ নয়, লোকভেদে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে তিনি বায়াত সম্পাদন করতেন। এর প্রতিপালনে লক্ষ্য করা যায় তাঁর একাধিক কালামে- ১. 'এ দরবারে ভক্তি বিশ্বাসে যারা আসে সবাই মুরিদ।' ২. ভয়, বিশ্বাস ও আদবের সাথে যারা এ দরবারের ঘেরার মধ্যে প্রবেশ করবে সকলে মুরিদ।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার প্রবর্তক এবং পরবর্তী কামেল অলিরা লম্বা চাদর টেনে বায়াত করার আনুষ্ঠানিকতার বিপরীতে স্বপ্ন ও বাস্তবে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রূহানী ফয়েজ প্রদানের মাধ্যমে বায়াতেই গুরুত্বারোপ করতেন।

হাসানবাগ হতে হক মন্‌জিল: ১৩৮০ সালের ৩০ আষাঢ় (১৯৭৩ সাল) বৃহস্পতিবার শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীকে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য সর্বপ্রথম বাগান বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত জরুরী বিজ্ঞপ্তিতে পিতা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী এক ঘোষণায় বলেন, ''আমার বড় পুত্র সৈয়দ জিয়াউল হককে স্বীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে রওজা শরিফ পুকুরের পূর্বদিকে বাগান বাড়িতে দুইকক্ষ বিশিষ্ট বাসগৃহ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন ইত্যাদির সুব্যবস্থা করত পৃথক বসবাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছি এবং তিনি নিজ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত।''

এ ত্বরিকার প্রবর্তক শাহ্ সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী আনুষ্ঠানিকভাবে মাত্র অল্প কয়েকজনকে সামনে বসিয়ে মুরিদ করিয়েছেন, সিংহভাগই ভিন্ন ভিন্ন কৌশলে ফয়েজ দানের মাধ্যমে কার্য সম্পন্ন করেছেন। তদীয় ভ্রাতুস্পুত্র ও প্রধান খলিফা হযরত বাবা ভাণ্ডারীর মুরিদ প্রথা ছিল সম্পূর্ণভাবে রূহানী জগতের মাধ্যমে। যেখানে দাস্ত বায়াতের কোন প্রসঙ্গই ছিলনা।

শাহানশাহ্ বাবাজানের বিশেষত্ব: তাঁর সমসাময়িককালে এ ভুখন্ডে বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদের উত্থানের বিপরীতে তাঁর যে আধ্যাত্মিক বিকাশ ও প্রভাব ধর্মপ্রাণ বিভ্রান্ত ও দিশেহারা জনগোষ্ঠীকে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষে ধাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা এতবেশী কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়ে পর্যবসিত। বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো তাঁর জীবনী শরীফে এর কিছু চুম্বকসার বর্ণনা পাওয়া যায়। যা পরবর্তীকালের গবেষকদের মূল্যবান তথ্য-নির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

তাঁর পুরা জীবনটাই ছিল একটা আধ্যাত্মিক অভিধান। যে অভিধান থেকে আমরা প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, টীকা-টিপ্পনী ইত্যাদি উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারি অতি সহজেই।

শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ছিলেন নিজেই একটা জীবন্ত কারামত। যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা সকলে একবাক্যে স্বীকার করবেন, তিনি ছিলেন এমন এক মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব যাঁকে দেখলেই অবচেতনভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়তে ইচ্ছে করতো। শুধু তাই নয়, তাঁকে দেখলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক আবহে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণে পড়ে যেত। বলাবাহুল্য, এটিই ছিল শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর মৌলিক অনন্য বিশেষত্ব। তিনি প্রায় সময় বলতেন 'আমাকে বুঝতে হলে কুরআন দেখ' তাঁর এই কালামের তাৎপর্য উপলব্ধি করা যায়, তাঁর সমগ্র জীবন সত্তায়। তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শনে এর প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে তাঁর অবদান: তাঁর পুরা জীবনটাই ছিল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। পবিত্র কুরআনের আলোকে দীনহীন জনগোষ্ঠীকে আমলে নিয়ে তাদের বিষয়টি সমাজ জীবনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এক অনন্য ভূমিকা পালন করছিলেন শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তাঁর কথায়, কাজে ও চিন্তায় এর প্রতিফলন ছিল সুস্পষ্ট। তিনি নিজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন অকাতরে। একইসাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তার কথা বলতেন সর্বত্র। দরবারে আগতদের এ বিষয়ে তাগাদাও দিতেন।

ওফাত: প্রতিদিন প্রায় প্রতিনিয়ত নানা আধ্যাত্মিক রহস্যময় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে মাত্র ৬০ বছর বয়সে ১৯৮৮ সালের ১২ অক্টোবর মধ্যরাত্রি, ১২টা ২৭ মিনিটের সময় তিনি চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে আল্লাহ্

রাব্বুল আলামিনের সাথে অনন্ত মিলনে মিলিত হন। বৃহস্পতিবার বিকেল সোয়া চারটা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত পর পর তিনটি জামাতে কয়েক লক্ষ লোক অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রামের বহুল প্রচারিত 'আজাদী' ও 'পূর্বকোণ'সহ বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার ভাষ্যমতে এটি ছিল দেশের দরবার শরিফসমূহের মধ্যে স্মরণকালের বৃহত্তম নামাযে জানাযা। ১৪ অক্টোবর 'দৈনিক আজাদী' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ৩ কলামব্যাপী সংবাদের শিরোনাম ছিল এই রকম- 'জানাযায় পাঁচ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ- শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর দাফন সম্পন্ন।' মাইজভাণ্ডার শরিফ গাউসিয়া হক মন্‌জিলের উদ্যোগে প্রতিবছর ২৬ আশ্বিন তাঁর পবিত্র উরস পালিত হয়।

বংশলতিকা: তাঁর এক পুত্র ৫ কন্যা। একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (১৯৬৯)। ৫ কন্যা (১) সৈয়দা জেবউননাহার, (২) সৈয়দা হুমায়রা বেগম, (৩) সৈয়দা উম্মে কুমকুম হাবীবা বেগম, (৪) সৈয়দা মুনমুন হাবীবা বেগম, (৫) সৈয়দা নূরে আসমা কানিজ ফাতেমা বেগম।

তদীয়পুত্রকে খেলাফত প্রদান: সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী তাঁর ওফাতের পূর্বদিন তাঁর একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে খেলাফতে অভিষিক্ত করে যান। যখন খেলাফত পদে অভিষিক্ত হন তখন তিনি সবেমাত্র কলেজের ছাত্র। এ অবস্থায়ও গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানসীন হিসেবে সব্যসাচীর মতো নিয়মিত লেখাপড়ার পাশাপাশি ভক্ত অনুরক্তদের আধ্যাত্মিক পরামর্শ, প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিয়ে চলতেন প্রতিনিয়ত।

তাঁর স্মরণে প্রকাশনা: সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী প্রায় সময় মজজুব হালে থাকতেন। প্রায় প্রতিনিয়ত নানা অলৌকিক ঘটনার জন্যে জীবদ্দশায় তিনি রীতিমতো কিংবদন্তিতে পরিণত হন। তাঁর কারামতপূর্ণ প্রতিদিনের চলমান ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবদ্দশায় রচিত হয় জীবনীগ্রন্থ- 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'। তদীয় একান্ত সহচর জামাল আহমদ সিকদার রচিত ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ডিমাই সাইজের ৩০৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয় তাঁর জীবদ্দশায়। বর্তমানে ২০১৭ তে এর ১৩তম সংস্করণ প্রবহমান। এছাড়া সৈয়দ আমিরুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ গোলাম রসুল তাঁর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশ করেন ইংরেজি ভাষায়। সৈয়দ আমিরুল ইসলামের গ্রন্থের নাম 'Shahanshah Ziaul Hoque Maizbhandari' প্রকাশকালঃ ১৯৯২, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৩০। মোহাম্মদ গোলাম রসুলের গ্রন্থের নাম 'The Divine Spark - Shahanshah Ziaul Hoque' (ক.) প্রকাশকাল ঃ ১৯৯৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৪৪।

সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে একটি স্বতন্ত্র মন্‌জিল গড়ে উঠেছে; এটি 'গাউসিয়া হক মন্‌জিল' - সংক্ষেপে 'হক মন্‌জিল' নামেই সর্বত্র পরিচিত ও প্রচারিত। এই 'হক মন্‌জিল' থেকে ১৯৮৫ থেকে 'আলোকধারা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবদ্দশায় তাঁর শানে অনেক কবিতা, গান ইত্যাদি রচিত হয়; এমন কি গানের বইও প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক মোঃ মাহবুব উল আলম প্রকাশ করেন গানের বই- 'ঐশি আলোর জলসা ঘর' এবং ১৯৯৭ সালে সম্পাদনা করেন- শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী: ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব গ্রন্থ। (দ্বি-স-২০০৫) তাঁকে কেন্দ্র করে পূর্বাপর সকল কর্মকাণ্ডকে একীভূত করে গঠিত হয়েছে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১১ [এতদসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য স্বতন্ত্র অধ্যায়ে সন্নিবেশিত।]

কারামত: শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনে প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো কারামতের বিষয় পরিলক্ষিত হতো। যাঁদের সাথে এই সমস্ত কারামতের ঘটনা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের নিজেদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকত। এর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ৬০টি কারামত সংগ্রহ করে তাঁর জীবনীগ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারামতের বর্ণনা

১. তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর ঘটনা, ২. তাঁর নাম স্মরণে ডুবন্ত ট্রলারের নিরাপদে উদ্ধার, ৩. তাঁর কৃপায় আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার, দশবছর আয়ুবৃদ্ধি, ৪. মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর তাঁর প্রভাব।

কিংবদন্তিতুল্য কারামত - তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর ঘটনা: শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর কারামত সমূহের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তেল ছাড়া গাড়ি চালানোর বিষয়। তাঁর কারামত প্রসঙ্গে এ বিষয়টিই সর্বাধিক পরিচিত ও প্রচারিত। তাঁর সমসাময়িককালে এ বিষয়টি সংশ্লিষ্টমহলে প্রায় মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। যারা তাঁর গাড়ি চালাতেন কিংবা যারা তাঁর সফরসঙ্গী হতেন তারা সকলেই অবিসংবাদিতভাবে একবাক্যে এ বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করতেন। শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর জীবনী গ্রন্থে এরকম ৫টি ঘটনার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এরকম একজন প্রত্যক্ষদর্শী ড্রাইভার শামসুল আলম মিয়াজীর (কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম) বর্ণনা ঃ আট নয় বছর ধরে আমি মামুজানকে নিয়ে গাড়ি চালানোর সুযোগ পেয়েছি। ঘটনার সংখ্যা আমি হিসাব করে বলতে পারব না। তবে ড্রাইভার হিসাবে একথাই জানি ও বলতে পারি যে, তেল ছাড়াও মামুজানের গাড়ি চলে। তেল থাকলেও ক্ষতি নাই, না থাকলেও ক্ষতি নাই। বহু সময় ট্যাংকে যে তেল নিয়ে বেরিয়েছি কক্সবাজারের মতো সুদূর জায়গা চক্কর দিয়ে এসেও দেখি তেল ততটুকুই রয়ে গেছে। এই অত্যাশ্চর্য-অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত দেখতে আমি এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, এগুলো আমার কাছে মোটেই আশ্চর্য মনে হয় না। এ সব

তাঁর শান।

বাণী চিরন্তন: শাহানশাহ্ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী তাঁর আধ্যাত্মিক পথ-পরিক্রমায় বেশিরভাগ সময় মজজুব হালে থাকতেন, রীতিমতো মহাসমুদ্রের কল্লোলের মতো। আবার কখনো কখনো একেবারে শান্ত অবস্থায় ফিরে আসতেন অনেকটা শান্ত সরোবরের স্নিগ্ধ জলের মতো। এইরূপ বিভিন্ন অবস্থায় তিনি অনেক মূল্যবান কালাম ব্যক্ত করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মজজুবহাল অবস্থায় কালাম সমূহে মূলত ত্বরিকা ও স্বীয় মাহাত্ম্যের উচ্চমার্গীয় আধ্যাত্মিক বর্ণনা এবং শান্ত অবস্থায় জাগতিক জীবনঘনিষ্ঠ বর্ণনাই মূখ্য। তাঁর পবিত্র বাণীসমূহকে নিম্নোক্ত ১৯টি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে-

১. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা মাহাত্ম্য, ২. মাইজভাণ্ডারী দরবার মাহাত্ম্য, ৩. প্রকৃত অলি-আল্লাহ্‌র দরবারের বিশেষত্ব, ৪. দরবার থেকে ফয়েজ-রহমত প্রাপ্তির নিয়ম ও কৌশল, ৫. স্বীয় মাহাত্ম্য, ৬. ঈমানের তাৎপর্য, ৭. বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা, ৮. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য, ৯. 'নিজেকে জানার' হেকমত রয়ান, ১০. মারিফতের সাধনায় নামাযের অপরিহার্যতা, ১১. প্রকৃত বায়াতের দায়-দায়িত্ব, ১৩. প্রকৃত জ্ঞানের সংজ্ঞা, ১৪. ভাল কাজকে ইবাদাতের সাথে তুলনা, ১৫. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে চলার কৌশল, ১৬. সর্বক্ষেত্রে নিয়ম শৃঙ্খলার গুরুত্ব, ১৭. শিশু-কিশোরদের দরবারে নিয়ে যাওয়ার হেকমত, ১৮. মানবসেবা ও মানব শ্রেষ্ঠত্ব, ১৯. জনগণের রাষ্ট্রীয় অভিভাবক হিসেবে সরকারের নৈতিক কর্তব্য নির্ধারণ।

এক নজরে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর বিশেষত্ব

১. গাউসুলআযম মাইজভাণ্ডারীর প্রপৌত্র, হযরত বাবা ভাণ্ডারীর দৌহিত্র এবং অছিয়ে গাউসুলআযমের রক্ত ও বেলায়েতের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী হিসেবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি রূপে তাঁর আবির্ভাব।

২. উল্লিখিত পবিত্র ত্রিধারার সংগম স্থলের অপূর্ব সৃষ্টি হিসেবে শুরু থেকেই তাঁর ব্যতিক্রমী আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব সংশ্লিষ্ট মহলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়।

৩. বাবার জীবদ্দশায় তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমার স্ফুরণ এবং স্বতন্ত্র সত্তায় বিকাশের সংকেত অনুধাবন করে, একে মর্যাদাপূর্ণভাবে আমলে নিয়ে তদীয় পিতা কর্তৃক স্বতন্ত্র মন্‌জিলে স্বতন্ত্রধারায় বসবাসের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা।

৪. প্রায় প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত তাঁর আধ্যাত্মিক রহস্যপূর্ণ জীবনাচরণ, শতশত কারামত এবং হাকিকতী সফর সমূহকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর ৬ দশক থেকেই তিনি রীতিমত কিংবদন্তিতে পরিণত হন।

৫. সমাজ জীবনের প্রায় সর্বস্তরের, বিশেষত রাষ্ট্র, সরকার ও বিদ্বৎ সমাজের স্বনামধন্য বিশিষ্টজনদের মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আলোকে আল্লাহ্ ও রাসুলের পথে আকৃষ্ট ও পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এক দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন।

৬. জীবদ্দশায় তদীয় একমাত্র পুত্রকে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মনোনয়ন এবং তাঁর হেকমতি নির্দেশনায় তদীয়পুত্র কর্তৃক পিতার আরদ্ধ কার্যক্রমকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট' গঠন এবং একবিংশ শতাব্দীর আলোকে এ সংগঠনকে পরিচালনার হেকমতপূর্ণ গুরুদায়িত্ব অর্পণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকার স্বরূপ উন্মোচন ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের যে শুভ সূত্রপাত করেছিলেন, তার সৃজনশীল বিকাশমান ধারার আরদ্ধ কাজটি নতুনভাবে নতুন মাত্রিকায় জীবন ঘনিষ্ঠভাবে হেকমতপূর্ণ শুদ্ধতম ধারায় প্রবহমান রেখেছে SZHM Trust. আগ্রহী পাঠক এতদবিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন এর নিম্নোক্ত ওয়েব সাইডে- www.sufimaizbhandari.org.bd

খোশরোজ ও উরস্ শরিফ:

প্রতি বছর ১০ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর শাহানশাহ সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর বার্ষিক খোশরোজ শরিফ এবং ২৬ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর বার্ষিক উরস শরিফ পালিত হয়।

[শাহানশাহ্ বাবাজানের পুরা জীবনটাই ছিল একটা আধ্যাত্মিক চলমান অভিধান। যা রীতিমতো গবেষণার উপাদানে ভরপুর। এই বিবেচনা বোধ থেকেই এ জীবন-পঞ্জি পরিচালনা।]

শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)।

১৯২৮-১৯৮৮

১৯২৮- জন্ম ২৫ ডিসেম্বর, ১০ পৌষ, ১৩৩৫

বাবা: অছি-এ- গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মা: মোসাম্মৎ সৈয়দা সাজেদা খাতুন।

দাদা: শাহ সুফী সৈয়দ ফয়জুল হক।

বড় দাদা: মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম শাহ্ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী।

নানা: কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলাম রহমান বাবা ভাণ্ডারী।

১৯২৯- ২ জানুয়ারী, সপ্তম দিবসে আকিকা অনুষ্ঠান। বহুদিন পর দরবারে সম্মিলিত একক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান এর শুভ সূচনা। ১৬ জানুয়ারী, জন্মের ২১ দিবসে নবজাতকের নিঃশ্বাস বন্ধ। নানা হযরত বাবা ভাণ্ডারীর পবিত্র হস্তনিঃসৃত পানি পান ও নিংড়ানো পানির ফোটার বদৌলতে পুনঃজীবন লাভ।

১৯৩২- গৃহশিক্ষক মৌলভী মোজাম্মেল হকের নিকট ধর্মীয় শিক্ষার হাতেখড়ি।

১৯৩৫-খতনা পরবর্তী বরণ অনুষ্ঠান উদযাপন। নানা হযরত বাবা ভাণ্ডারীর আর্শিবাদ লাভ। তৎকালীন স্থানীয় আহমদিয়া

জুনিয়র মাদ্রাসায় ভর্তি।
১৯৪১- ফটিকছড়ি করোনেশান হাই স্কুলে ভর্তি।
১৯৪২- নানুপুর আবু সোবহান উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি।
১৯৪৫- নানুপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পাস।
১৯৪৬- চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি।
১৯৪৮- ৩১ আগস্ট, কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (এস.এস.সি) পাস ।
১৯৪৯- চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি।
১৯৫১- চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই.এ (এইচ.এস.সি) পাস। বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়া কলেজে বি.এ শ্রেণীতে ভর্তি।
১৯৫৩ কানুনগোপাড়া কলেজে বি.এ টেস্ট পরীক্ষাকালে জজবিয়াত হালতে পরীক্ষা-হল ত্যাগ। জাগতিক প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার এখানেই সমাপ্তি। পারিবারিক মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য ঢাকা গমন ।
১৯৫৪- পিতা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ব্যবস্থাপনায় আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের খতিব শায়খুল হাদীস মাওলানা ছফিরুর রহমান হাশেমীর হাতে আনুষ্ঠানিক বায়াতের সবক গ্রহণ।
১৯৫৫- ২৮ জানুয়ারী-মঙ্গলবার ফটিকছড়ির দাঁতমারা ইউনিয়নের স্বনামধন্য জমিদার বদরুজ্জামান চৌধুরীর [বদন সিকদার] কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মৎ সৈয়দা মনোয়ারা বেগমের সাথে শুভ পরিণয়।
১৯৬৬- ৯ মাঘ, ২২ জানুয়ারী, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তদীয় পিতা হতে আনুষ্ঠানিক খেলাফত লাভ এবং তদীয় পিতার কাছে সংরক্ষিত গাউসে পাকের খয়েরী রং এর চাদরটি তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ।
১৯৬৭- এপ্রিল, চিকিৎসার জন্য পাবনা মানসিক হাসপাতালে ভর্তি।
১৯৬৯-১৯ ডিসেম্বর, একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান এর জন্ম।
১৯৭৩- (৩০ আষাঢ়-১৩৮০) পিতার তত্ত্বাবধান-মুক্ত অঙ্গনে তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা বিকাশের স্বতন্ত্র ধারার দ্বার উন্মোক্তার প্রয়োজনে পিতা কর্তক গাউসিয়া আহমদিয়া মনজিল থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র সত্তায় স্বতন্ত্র মন্‌জিল-হাসান বাগে (পরে হক মনজিলে রূপান্তর) সপরিবারে থাকার ব্যবস্থা।
১৯৭৪ একমাত্র পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান সম্পর্কে হাকিকতী মন্তব্য- "আমার হাসান মিয়া না বাঁচলে দুনিয়াতে কোন শিশু বাঁচবেনা।"
৬ এপ্রিল, তাঁর প্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের প্রতি অছিয়ে গাউসুল আযমের স্বপ্নাদেশ।
২৭. আশ্বিন (১৯৭৪) বাবা ভাণ্ডারীর খোশরোজ উপলক্ষে স্বীয় মনজিলের সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ, আনুষ্ঠানিকভাবে সভাপতিত্ব ও মুনাজাত পরিচালনা।
১৯৭৬- ১০ পৌষ, গাউসিয়া হক মন্‌জিলের উদ্যোগে প্রথম খোজরোশ অনুষ্ঠান। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে দায়রা শরিফ গড়ে তোলার আহবান।
১৯৭৮- গতানুগতিক ধারায় বায়াত করা বন্ধ করে দেন।
১৯৮২- ১ মাঘ, তদীয় পিতা ও মুর্শিদ অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর ওফাত।
১৯৮২- ডিসেম্বর, তাঁর জীবনী 'শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' গ্রন্থের প্রকাশ । লেখক: জামাল আহমদ সিকদার।
১৯৮৩- ৭ সেপ্টেম্বর, দরবারের প্রতি খেদমতের, আত্ম নিবেদনে তদীয় প্রধান খলিফা সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহের কিংবদন্তিতুল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর হাকিকতি মন্তব্যঃ "ইনি [বখতেয়ার শাহ] আমার বাবাজানের খলিফা, গাউসুল আজমের শানে, বাবাজানের শানে ২৫টি বই লিখেছেন।"
১৯৮৪। ২৪ ডিসেম্বর, শাহানশাহ বাবাজানের নির্দেশে হক মন্‌জিলের ছয়তলা মেহমান খানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন হক মনজিলের এন্তেজামিয়া কমিটির সভাপতি ও তদীয় প্রধান খলিফা সৈয়দ নূরুল বখতেয়ার শাহ।
১৯৮৫- গাউসিয়া হক মন্‌জিলের মুখপত্র 'আলোকধারা'র প্রকাশ।
১৯৮৫- ৫ নভেম্বর, গাউসিয়া হক মনজিলের পুকুর সেঁচে সবগুলো মাছ এলাকার দোকানদার, কুলালপাড়া ও আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান।
১৯৮৬- ২২ নভেম্বর, তাঁর স্বগতোক্তি ঃ "এ পুকুরটা ভরাট করে ঘর তৈরি করতে হবে। এখানে অনেক অনেক লোক আসবে।"
১৯৮৭- ১৫ জুলাই- তাঁর বেশী ব্যবহার্য বড় চেয়ারটা উল্টিয়ে রেখে একদিন পর পুন:স্থাপন।
১৯৮৭- ২৩ জুলাই, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরীর মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তাঁর কাছে এসে দোয়া কামনা।
১৯৮৭-আগস্ট, চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী পত্রিকার সম্পাদক ও সাবেক গণপরিষদ সদস্য, অধ্যাপক মুহাম্মদ খালেদ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে যুগপৎ মনোবল ও কর্মশক্তি হারিয়ে অবশ হাত নিয়ে মাইজভাণ্ডার শরিফে শাহানশাহ বাবাজনের হুজরায় এসে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠেন, "বিকলাঙ্গ, বেইজ্জতীর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়।" তাঁর ফরিয়াদ শুনে শাহানশাহ বাবাজান মুখে কিছু না বলে একটা গ্যাস লাইটার উজ্জ্বল শিখায় দীর্ঘক্ষন জ্বলিয়ে রাখেন। উল্লেখ্য, এ ঘটনার পর খালেদ সাহেব প্রয়োজনীয় সুস্থ হয়ে উঠে পুনরায় সাংবাদিকতা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করে চট্টগ্রামের একজন অবিসংবাদিত সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবিতে পরিগনিত হয়ে ওঠেন।
১৯৮৭- ৭ অক্টোবর, প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরীর পুনরায় দরবার শরিফে এসে শাহানশাহ বাবাজানের দোয়া,

দয়া ও বিশেষ কৃপা লাভের ঐকান্তিক নিবেদন। বাবাজান তাঁর হুজরা শরিফে প্রধানমন্ত্রীকে টানা ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট একান্ত সোহবতে অবস্থান এর সুযোগ প্রদান। এ সময়েই সরকার ও জনগনের সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর নিম্নোক্ত পবিত্র কালামটি প্রকাশ পায়। "সন্তান কষ্ট পেলে বাবা মা'রও কষ্ট হয়। দেশের মানুষ কষ্ট পেলে সরকারেরও কষ্ট হয়। জনগনতো আপনাদের সন্তানের মতো, তাদের যাতে কষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখবেন । মনে রাখবেন, জনগনের সুখ-শান্তিতেই সরকারের শান্তি ও স্থিতি।"

২৮ অক্টোবর- হুজরা শরিফের পূর্বপাশের বাঁশের বেড়া পুকুরে ফেলে দেয়ার নির্দেশ ।

১ ডিসেম্বর- পার্শ্বস্থ ভাণ্ডার শরিফ আহমদীয়া প্রাইমারী স্কুলে ১০০ ও ২০০ ওয়াটের ২টি বাল্ব লাগানোর নির্দেশ ।

৯ ডিসেম্বর- ৬ তলা ভবনের ৪ তলায় নিজের বসার চেয়ারখানা উল্টিয়ে রাখেন।

২৬ ডিসেম্বর- শাহানশাহ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) গ্রন্থের ২ সংস্করণের প্রকাশ।

১৯৮৮- ১ জুন- জীর্ণ কাচারি ঘরটি তাঁর অনুমতিক্রমে পুন:নির্মানের নিমিত্তে ভেঙ্গে ফেলা।

২০ ফেব্রুয়ারী- হুজরা শরিফের সামনের ঝাড়বাতি দুটো কাচারিতে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ।

৬ জুন- তাঁর মা-জানের বার্ষিক ফাতেহা শরিফের রাতে সেমা মাহফিলে উপস্থিত এবং মাহফিল শেষে দাঁড়িয়ে দু'হাত ছড়িয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘক্ষণ মুনাজাত এবং ফজলী আমের তাবারুক বিতরণের নির্দেশ প্রদান।

১০ আগস্ট-খুব ভোরে চট্টগ্রাম শহরে গিয়ে বড় মাপের পাঙ্গাস মাছ কিনে দরবারে রেখে পুনরায় শহরে গমনের সময় গাড়ী রাখার পাকা গ্যারেজটা ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ এবং একইসাথে উল্লিখিত দুই কক্ষকে দেখিয়ে পবিত্র কালাম- "এগুলো আল্লাহ্‌র ঘর।"

১০ সেপ্টেম্বর : গ্যারেজ ভাঙ্গার কাজ শেষে হুজরা শরিফের সামনে পেছনের দেয়াল ভাঙ্গার প্রক্রিয়া শুরু হলে শ্রেণীবন্ধু আফছার উদ্দীনের জিজ্ঞাসার জবাবে কালাম করেন- "এখানে শাহী দরবার হবে তাই।"

চট্টগ্রাম শহরে প্রায় সকল বিশিষ্টভক্ত ও আত্মীয়ের বাসায় দেখা দিয়ে আসেন।

১২ সেপ্টেম্বর- চট্টগ্রাম বন্দরের অফিসার্স কলোনীর বাসায় ক্যাপ্টেন রমজান আলী সাহেবের বড় ছেলে রিজোয়ান আলীকে ভিডিও করার সম্মতি প্রদান। উল্লেখ্য, সস্ত্রীক ক্যাপ্টেন রমজান আলী, খালেকুজ্জামান সাহেব এবং খাদেম রফিকের উপস্থিতিতে ২০-২৫ মিনিটের ধারণকৃত এ অডিও ভিডিওটি বর্তমানে মাইজভাণ্ডারী মরমী গোষ্ঠীর হাসান শরিফ খান এর কাছে সংরক্ষিত আছে।

১ অক্টোবর, সকালে কারযোগে হুজরা শরিফ থেকে শহরে পাঠানটুলীর আকমল খানের বাসায় অবস্থান। হাদিয়া কেনার জন্য বাজারে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনার প্রেক্ষিতে সৈয়দ নুরুল বখতেয়ার শাহকে লক্ষ করে তাৎপর্যপূর্ণ পবিত্র কালাম'এবারে ক'দিন ধরে বহু গরু-মহিষ জবেহ করতে হবে। অনেক লোক সমাগম হবে।"

৬ অক্টোবর- সকাল ১১ টায় আকমল খানের বাড়ি থেকে উদোম শরীরে লুঙ্গি পরা অবস্থায় নিজ টয়োটা গাড়ি করে বেরিয়ে পড়েন।

৮ অক্টোবর- রাঙ্গামাটি শহরের স্বর্ণটিলায় তফাজ্জল হোসেন চৌধুরীর ছোটবোনের বাসায় অবস্থানকালে গভীর রাতে ৪০ মিনিটের জন্য হৃদস্পন্দন পুরাপুরি বন্ধ।

৯ অক্টোবর-রাঙ্গামাটি থেকে চট্টগ্রাম শহর অভিমুখে যাত্রাকালে গাড়ীতে বাদশা হাজীকে পাশে বসিয়ে পবিত্র হজ্বের দোয়া পড়তে বলে একইসাথে নিজেও পড়তে থাকেন, 'আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লা শরিকা লাকা লাব্বায়েক।" শহরে এসে হযরত আমানত শাহ (রঃ) এর মাজার ও পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে গমন । হাসপাতালে ভর্তি করাতে চাইলে বিকেলে ভর্তির কথা বলে চট্টগ্রাম বন্দরের দক্ষিণ অফিসার কলোনিতে ক্যাপ্টেন রমজান আলীর বাসায় গমন। এ বাসায় দুপুরে প্রায় ৩৫ জন ভক্ত-শিষ্যের সাথে জীবনের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক ভোজনপূর্ব শেষে বারংবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যেতে নাহি দেব' কবিতার কটি পঙতি আবৃত্তি এবং গুনগুন করে গাইলেন 'এই যে দুনিয়া কিসারে লাগিয়া" গানটি।

বিকেল সাড়ে তিনটায় আবার গেলেন হযরত আমানত শাহ (রঃ) এর মাজার এবং পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে। ফেরার পথে পুনরায় আমানত শাহ (রঃ) এর মাজারে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ; কিন্তু গাড়ীর চাকা নষ্ট হওয়ায় সকলে মিলে গাড়ীকে ঠেলে বন্দর হাসপাতালে নিয়ে অনেকটা জোর করে তাঁকে ১ নং কেবিনে ভর্তি। ইসিজি রিপোর্টে দেখা গেল গুরুতর হার্ট এ্যাটাক কিন্তু বাহ্যিকভাবে রোগের কোন লক্ষণ নেই; কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন স্বাভাবিকভাবে। প্রধান চিকিৎসক ডাঃ আবদুল মান্নানের তত্ত্বাবধানে ৬ ঘন্টা পর পর ২ বার মরফিন ইনজেকশন প্রয়োগ, কিন্তু ঘুমের কোন লক্ষণ নেই। রাত ১০ টায় স্বেচ্ছায় ঘুমিয়ে পড়েন।

১০ অক্টোবর, সোমবার-সকাল ১১ টায় মেডিকেল বোর্ড গঠন। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনি নারাজ, এমনকি বন্দর হাসপাতালও ছেড়ে দিতে চান। অগত্যা ঘুমের জন্য হাইডোজ সিডাকসিন ৪ ঘন্টা অন্তর অন্তর। কিন্তু এর পরও ঘুমের কোন লক্ষন নাই। চিকিৎসকরা হতবাক; চিকিৎসা বিজ্ঞান ফেল। নির্ঘুম রোগী নিজ কাজে ব্যস্ত। ডাক্তারদের, বিশেষ করে তদীয় ছোট ভাই ডাঃ সৈয়দ দিদারুল হকের নির্দেশে গেটে তালা লাগিয়ে বাইরে পাহারার ব্যবস্থায় রোগীর স্বগতোক্তি- 'আল্লাহ্‌র মাল আল্লাহ্ নিয়ে গেলে তালা দিয়ে কি রাখা যাবে?"

১১ অক্টোবর, মঙ্গলবার-নিউ মার্কেট থেকে একজোড়া হ্যান্ড গ্লাভস আনায়ন। পছন্দ না হওয়ায় বদলানোর ঘটনা ।

সর্বক্ষণ আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির । হযরত আমানত শাহ (রঃ) দরগাহ এবং সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার জন্য ছটফট অবস্থা, কিন্তু বের না হয়ে জিকিরে নিমগ্ন।

১২ অক্টোবর, বুধবার-ভোর চারটায় ১ নং কেবিন থেকে বেরিয়ে পাশে ২নং কেবিনে গিয়ে সহধর্মিনীকে নামায পড়তে ডেকে দিলেন এবং পুত্র সৈয়দ মোহাম্মদ হাসানকে একগ্লাস হরলিক্স খাওয়ার নির্দেশ ও একটি আপেল প্রদান । অত:পর সহধর্মিনীর সম্মতি চেয়ে 'হাসানকে নিয়ে একটু হাওয়া খেয়ে আসি। আপনার নিকট ফিরে আসবো।" বলে সকাল ৭টায় কেবিন থেকে বেরিয়ে গাড়ী আনতে নির্দেশ, চালক নাজিমের ৫১৫২ গাড়িতে শাহজাদাকে সামনের সিটে বসিয়ে নিজে পেছনের সিটে বসে পড়েন। পাশে আবদুল মতিন চৌধুরীকে নিয়ে পতেঙ্গ সমুদ্র সৈকত ঘুরে ক্যাপ্টেন রমজান আলীর বাসায় এসে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা ও চা মিষ্টি কবুল। অতঃপর আলী নবী চৌধুরীর কন্যার রেওয়াজ অবস্থায় হারমোনিয়াম চেয়ে নিয়ে নিজে দরদভরা কণ্ঠে গাইতে শুরু করেন–

এই যে দুনিয়া, কিসের লাগিয়া/এত যত্নে গড়াইয়াছে সাঁই।
ছায়া বাজি পুতুল রূপে বাইয়া মানুষ
যেমনি নাচাও, তেমনি নাচি / পুতুলের কী দোষ–...
আমার মনে এই আনন্দ, / (আমি) কেবল আল্লাহ্ তোমায় চাই।...
তুমি বাঁচাও, তুমি মার/ আল্লাহ্ তুমি বিনে কেহ নাই ॥

সকাল ১০টায় কক্সবাজার যাওয়ার কথা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে পূর্বোক্ত গাড়িতে সামনের সীটে শাহজাদাকে উঠতে বলে পেছনের সীটে জহিরুল হক সহ বসে পড়লেন। দুপুর ২.২৫ মিনিট কক্সবাজারের হোটেল সায়মনে পৌঁছার পর নিজে গাড়িতে কিছুক্ষণ অবস্থান, অনুগামী সহযাত্রীরা গাড়ি থেকে নেমে পড়লে পুনরায় গাড়িতে উঠার নির্দেশ দিয়ে দৃশ্যমান ঝাউগাছের ঝোপ এবং সমুদ্রের ফেনিল জলরাশির দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে বলাকা হোটেলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে, বলাকা হোটেলেও গাড়ি না থামিয়ে পুনরায় চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা। পথিমধ্যে তাঁর অসুস্থতার লক্ষণ দেখে দুলাহাজারা হাসপাতালে ভর্তির সম্মতি চাইলেন বলেন ওএড় অযবধফ - সামনে চল'। উল্লেখ্য, এ সময়কালে তিনি সারাক্ষণ জিকিরে মশগুল ছিলেন এবং একইসাথে পথে পথে সালাম জানাচ্ছিলেন এবং সালামের জবাব দিচ্ছেন। চকরিয়া পার হওয়ার পর মাত্রাতিরিক্ত ঘাম বের হওয়া এবং নিজের হাত দিয়ে বাম পাশ চেপে ধরে 'ইয়া আল্লাহ্ এয়া মুর্শিদ' উচ্চারণ। এমতাবস্থায় শাহজাদা নিজের প্রয়োজনে বাবাকে আরো কিছুদিন থাকার আর্জি জানালে শুধু উপরের দিকে অংগুলি-ইঙ্গিত করেন। এ সময়কালে দ্রুত গাড়ি চালিয়ে দোহাজারী হাসপাতালে কিছুক্ষণের জন্য ভর্তি এবং অক্সিজেন ও ইনজেকশান প্রদান। সন্ধ্যা ৭টায় শহরের বন্দর হাসপাতালে আগমন; পুনরায় ১নং কেবিনে অবস্থান। এ সময় ডাঃ মান্নানের নেতৃত্বে চিকিৎসকদল নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে দেখেন সমগ্র দেহ অচেতন-শীতল। হার্টবিট, পাল্স, ব্লাড প্রেসার কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তবুও অক্সিজেন ও ইনজেকশান দেওয়া হলো। ৭-১২টা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সময়কাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের যাবতীয় সূত্র ও সূত্রায়নকে রীতিমতো গোলক ধাঁধায় ফেলে রাত প্রায় ১২টার সময় সুস্থ মানুষের মতো শোয়া থেকে উঠে যাবতীয় চিকিৎসা-সংযোগ শরীর থেকে খুলে ফেলার ইঙ্গিত করে এক গ্লাস পানি চেয়ে নিজ হাতেই তা পান করলেন। অতঃপর তারিখ জানতে চাইলে ১২ অক্টোবর শুনে তাঁর স্বগতোক্তি:

একটু পরে ঘড়িতে সময় রাত ১২টা অতিক্রম করলেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার হয়ে যাবে ১৩ অক্টোবর। আসরের পর চাঁদের তারিখ পরিবর্তন হয়ে এখন ১ রবিউল আউয়াল। সূর্যোদয় থেকে বাংলা সনের ২৬ আশ্বিন। আপনাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে।

এ কালাম শুনার পর আলী নবী চৌধুরীর বিনীত জিজ্ঞাসা 'এখন কী করবেন'। উত্তরে জানালেন–'আমি আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করছি। আপনারাও আল্লাহ্ আল্লাহ্ করুন।' অতঃপর কম্বল গায়ে দিয়ে শেষ বারের মতো শুয়ে পড়েন।

'আপনারাও আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করুন' অন্তিম মুহূর্তের এ কালাম-সুমধুর বাণী শুনে বন্দর হাসপাতালের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় সমবেত শত শত আশেক ভক্তের হৃদয় নিংড়ানো "আল্লাহ্ আল্লাহ্" জিকিরের ঈমানী জোশের অভাবনীয় তুঙ্গীয় বহিঃপ্রকাশের সাথে অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটে। হাসপাতালের ইবাদত খানায় ন্যূনতম ত্রিশজন আলেমের কুরআন তেলাওয়াতের সুমধুর ব্যঞ্জনা। ইতোমধ্যে এক পশলা বৃষ্টি– আল্লাহ্র মেহেরবাণীর নীরব ঘোষণা, সব মিলিয়ে সৃষ্টিজগতকে আন্দোলিত করে অভাবনীয় অভূতপূর্ব এক আধ্যাত্মিক ভাব-গম্ভীর পূত-পবিত্র পরিবেশে রাত ১২টা ২৭ মিনিটের সময় আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকিরের মরমী ছন্দে তিনি আল্লাহ্র সাথে চিরস্থায়ী মিলনে ধন্য হলেন। (ইন্নালিল্লাহি---রাজিউন)। জাগতিক অবসান ঘটে ৫৯ বছর ৯ মাস ১৯ দিনের এক মহাকাব্যিক জীবনের।

১৩ অক্টোবর বিকেলে মাত্র ৩ ঘণ্টা সময়ের ব্যবধানে ৩টি জামাতে পাঁচ লক্ষাধিক আশেক ভক্তের অশ্রুসিক্ত উপস্থিতিতে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ইতিহাসে স্মরণকালের বৃহত্তম নামাযে জানাযা শেষে তাঁর বহুল স্মৃতি বিজড়িত হুজরা শরিফে তাঁকে দাফন করা হয়। যেখানে বর্তমানে শোভা পাচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় ফুল শাপলার প্রতিকৃতিতে দৃষ্টিনন্দন, ইতিহাসের প্রথম স্থাপত্য শিল্প। যা কিংবদন্তির আধ্যাত্মিক মহাপুরুষ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর চিরায়ত শাশ্বত মাহাত্ম্য ঘোষণা করে চলেছে অহোরাত্র-ইতিহাসের প্রবহমান ধারায়।

ইসলামে নারীর অধিকার

• মুহাম্মদ নুর হোসাইন •

একটি আত্মা থেকে মানব জাতির সৃষ্টি। ঐ আত্মা থেকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে একজন নারীকে। সে আত্মা ছিল হযরত আদম (আঃ) এর। আর যে নারীকে সর্বপ্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত হাওয়া (আঃ)। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এটি মানব সৃষ্টির মূল পদ্ধতি। তাই মানুষের মাঝে লিঙ্গের ভিন্নতা থাকলেও সৃষ্টিগত দিক থেকে তাদের উৎস একটি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, "মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পর পরিচিত হও।" (সুরা হুজুরাতঃ ১৩)

লিঙ্গের ভিন্নতার কারণেই মানুষের গঠন, আকৃতি, আবেগ-অনুভূতি ও স্বভাব-চরিত্রের ভিন্নতা সুস্পষ্ট ও সুবিধিত। সুতরাং দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকা স্বাভাবিক ও যৌক্তিক ব্যাপার। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মূলত 'নারী অধিকার' কথাটির প্রচলন হয়েছে। আবার যুগে যুগে নারীদেরকে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এ কারণে 'নারী অধিকার' পরিভাষার প্রচলন হয়েছে। ইসলামের বিধানালোকে নারীরাও মানব জাতির পরিপূর্ণ অংশ। মানুষ হিসেবে যেমন তাদের দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে, নারী হিসেবেও তাঁদের বিশেষ দায়িত্ব ও সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত রয়েছে। তবে এটি বাস্তব যে, প্রাক ইসলামী যুগে তাঁদের মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন ছিল না, নারী হিসেবেও তাদের অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। আরবে কন্যা সন্তানকে অশুভ ও অপমানের কারণ মনে করা হত। এ অপমান থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা তাদের কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত কবরস্থ করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। শুধু আরব সমাজে নয় বরং বিশ্বের সকল ধর্ম ও জাতির নিকট নারীর এ অবস্থান অভিন্ন ছিল। কেউ তাদেরকে অপবিত্রতার কারণ, কেউ দুর্ভাগ্যের কারণ আবার কেউ তাদেরকে পাপের উৎস মনে করত। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতে রোম শহরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ (Council of the wise) এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, Woman has no soul "নারীর কোন আত্মা নেই।" নারী সম্পর্কে প্রাক ইসলামী যুগের এমন বিশ্বাস ও তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে, "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শুনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে এভাবে অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতিয়ে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা বড়ই নিকৃষ্ট।" (সূরা নাহালঃ ৫৯-৬০) আরও ইরশাদ হচ্ছে, "স্মরণ কর, যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল।" (সূরা তাকভীরঃ ৮-৯)

ইসলাম নারী সমাজকে এহেন নাজুক অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছে, তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করেছে, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে যথাযথ মর্যাদার আসনে। আল-কুরআনে তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে বহু আয়াত। আল্লাহ্র নবী (দঃ) সেগুলো যথাযথ বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে গেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নারী অধিকার সংরক্ষণে ইসলামের বক্তব্য উপস্থাপনের চেষ্টা করব।

নারী অধিকার কী?

মানুষ হিসেবে মানবাধিকারের পাশাপাশি নারী হিসেবে যা কিছু বিশেষ অধিকার রয়েছে সেগুলোকে নারী অধিকার বলা যায়। ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত জাতিসংঘের Human Rights, Questions and Answers এ বলা হয়েছে, "সাধারণভাবে এমন কতগুলো অধিকার হল মানবাধিকার যা প্রকৃতিগতভাবেই আমরা লাভ করে থাকি এবং যা ছাড়া আমরা মানবীয় প্রাণী হিসেবে বেঁচে থাকতে পারি না।" সুতরাং প্রকৃতিগতভাবে নারীরা যা কিছু লাভ করে এবং যা ছাড়া নারীর জীবন চলে না সেগুলোকে নারী অধিকার বলা যায়। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, নারী হিসেবে তাদের যে বিশেষ অধিকার যেমন মাতৃত্ব, মাহর ইত্যাদি নারী অধিকার। নারী জীবনকে আমরা পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন- **এক.** অবিবাহিতা নারী, **দুই.** বিবাহিতা নারী **তিন.** বিধবা নারী **চার.** পোষ্য নারী এবং **পাঁচ.** অসহায় নারী।

উল্লেখিত প্রত্যেক শ্রেণির নারীর নির্দিষ্ট অধিকার পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। সংশ্লিষ্ট পুরুষ ব্যক্তিকে সে অধিকার প্রদান করতে হয়। যেমন- জন্মের পর থেকে বিবাহ অবদি একজন পিতা তার কন্যা সন্তানের অধিকারগুলো যেমন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি পূরণ করবে। এটি পিতার জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব। এর বিনিময়ে পিতার জন্য রয়েছে পরকালীন পুরস্কার। যেমন পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে, "কোন মুসলমান যদি প্রতিদানের আশায় তার পরিবারের জন্য খরচ করে তাহলে সেটি তার পক্ষ থেকে ছাদ্কা হিসেবে বিবেচিত হবে।" (বুখারী-মুসলিম)

এ প্রসঙ্গে আরও ইরশাদ হচ্ছে, "যে ব্যাক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে

কিয়ামতের দিন আমি ও সে এক সাথে থাকব।" (মুসলিম)
বিবাহোত্তর নারী তার স্বামীর নিকট অধিকার প্রাপ্ত হবে। দাম্পত্য জীবনের চাহিদাসহ একজন স্বামীকে তার স্ত্রীর সকল মৌলিক অধিকার পূরণ করতে হবে। এ সকল অধিকার প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করেই একজন স্বামী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। স্বামীর পক্ষে যদ্দুর সম্ভব তা আদায় করতে হবে। কোন ছল-চাতুরীর বা কুটকৌশলের আশ্রয় নেয়া যাবে না। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সুন্দরভাবে জীবন-যাপন কর।" (সূরা নিসাঃ ১৯)
হাদীস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" (তিরমিযি)
কোন নারীর স্বামী যদি মারা যায় অথবা তালাকপ্রাপ্ত হয় তাহলে তার দায়িত্ব তার পিতার উপর বর্তাবে, যদি তার কোন উপযুক্ত ছেলে সন্তান না থাকে। যেমন হযরত সুরাকা বিন জুসয়াম (রঃ) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) বলেছিলেন, "আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম দানের কথা বলব না? তিনি বললেন, আপনি অবশ্যই বলবেন। তখন আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) বললেন, "সর্বোত্তম দান হল, তোমার বিধবা কন্যার জন্য ব্যয় করা, যার কোন উপার্জনকারী নেই।" (ইবনে মাজাহ)
পোষ্যনারী বলতে আমরা সন্তানের নিকট পোষ্যনারীকে বুঝাতে চাই। অর্থাৎ যে নারী বিধবা হয়েছে অথবা যার স্বামী উপার্জনাক্ষম, তার যদি উপযুক্ত ছেলে থাকে তাহলে ঐ পুত্র সন্তান মায়ের ভরণ-পোষণের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে। এটি ছেলের উপর আবশ্যিক দায়িত্ব এবং কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত 'ইহসান' বা তাদের প্রতি সদাচারনের অন্তর্ভূক্ত। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "তিনি আরও নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করবে।" (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৩)
উপর্যুক্ত চার শ্রেণির নারী ব্যতীত বাকিরা অসহায় নারী, যদি তাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি অথবা ব্যবসা বা কোন চাকুরী না থাকে। এমন নারীর দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, " যদি কোন মুমিন সম্পদ রেখে মারা যায় তার ওয়ারিশগণ তার রেখে যাওয়া সম্পদগুলো পাবে আর যদি সে দেনা বা অসহায় কাউকে রেখে যায় তাহলে তার দায়িত্ব আমার উপর।" (বুখারী)

নারীর অর্থনৈতিক অধিকার

প্রত্যেক নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর বর্তালেও ইসলাম নারীর স্বতন্ত্র অধিকার তথা সম্পদের মালিক হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করেনি। ব্যবসা, চাকুরী, চাষাবাদ ইত্যাদির মাধ্যমে অথবা বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদের মালিকানা তো দেয়া হয়েছে উপরন্তু পুরুষের মতই উপার্জনের অধিকার দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হচ্ছে, "পুরুষরা যা উপার্জন করবে তারাই তার মালিক, আর নারীরা যা উপার্জন করবে তারাই তার মালিক।" (সূরা নিসাঃ ৩২)
নারীর সম্পদের উৎসগুলোকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-

এক. মাহর বাবৎ প্রাপ্ত সম্পদ

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার বিনিময়ে স্বামীর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সম্পদই মাহর। এ সম্পদ একান্ত তার। স্বেচ্ছায় না দিলে কেউ তা ব্যয় বা ভোগ করতে পারবে না। তার স্বামীও তার অমতে ব্যয় বা ভোগ করতে পারবে না। মাহর যদি প্রদান করা না হয় অথবা বাকীতে পরিশোধ করার ব্যাপারে স্ত্রী সম্মতি জ্ঞাপন না করে তাহলে স্বামীর জন্য তার স্ত্রী বৈধ হবে না। স্ত্রী যদি বাকীতে পরিশোধের ব্যাপারে সম্মতি দেয় তাহলে তার জন্য একটি সময় নির্ধারিত হতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তা পরিশোধ করতে হবে। ইত্যবসরে যদি স্বামী মারা যায় অর্থাৎ মাহর আদায় না করে কোন স্বামী মারা গেলে তাহলে তার স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। (হেদায়া)

দুই. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ

পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয় ও স্বামী থেকে নারীরা মিরাস পাবে। পুরুষরা যেমন পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয় সম্পদের অংশ পাবে নারীরাও পাবে। তবে আত্মীয়তার ঘনিষ্টতার ভিত্তিতে কেউ বেশি আবার কেউ কম পাবে। ইরশাদ হচ্ছে, " পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যাবে তার অংশ রয়েছে পুরুষের জন্য আর পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়া যা রেখে যাবে তার অংশ পাবে নারীরাও, সেটা কম হোক বা বেশি।" (সূরা নিসা ঃ ৭)
এ ক্ষেত্রে একটি বিধান হল নারী উত্তারাধিকারীর যদি ভাই থাকে তাহলে সে ভাইয়ের অর্ধেকাংশ পাবে। যেমন সূরা নিসার ১১ তম আয়াতে বলা হয়েছে, "একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর অংশের সমান।"
আল-কুরআনের এ বিধানের ব্যাপারে অনেকেই ইসলামের বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য নীতির অভিযোগ তুলেছে। অথচ ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব দিয়েছে অনেক কম। বরং পুরুষদের উপর দায়িত্ব বেশি। এ বিবেচনায় উল্লেখিত নীতি কোনভাবে বৈষম্যমূলক বলা যায় না। অন্যান্য বিধান ও বাস্তবতার নিরিখে এমন অভিযোগ মোটেই টিকতে পারে না। যেমন,
ক. নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পুরুষের উপর দেয়া হয়েছে, কিন্তু পুরুষের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাদেরকে দেয়া হয়নি।
খ. পিতা মারা যাওয়ার পর পরিবারের অন্যান্য উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে পুরুষকে, নারীকে দেয়া হয়নি। এমনকি পিতার অনুপস্থিতিতে উক্ত নারীর

দায়িত্বও দেয়া হয়েছে তার ভাইকে।

গ. পিতার বংশ রক্ষা করা পুত্র সন্তনের দায়িত্ব; কন্যা সন্তানকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

ঘ. বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ যেমন তার যৌন ক্ষুধা নিবারণ করে এবং অন্যান্য পারিবারিক বা সামাজিক সুবিধা ভোগ করে নারীও তাই করে অথচ বিবাহের জন্য নারীকে কোন মাহর দিতে হয় না।

ঙ. সংসার জীবনে সাধারণত: নারীর তেমন খরচ নেই কিন্তু পুরুষের খরচ বহুমুখী। তাই পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভাইয়ের তুলনায় বোনের অংশ কম হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

তিন. পেশাগত উপার্জন

ইসলাম ধর্মে নারীকে পেশাগত জীবন ভোগে বাধা প্রদান করা হয় নি, যদিও স্বামীর ঘরের নেতৃত্ব ও দায়িত্বের প্রয়োজনে পেশাগত জীবনের প্রতি উৎসাহিত করা হয়নি। হযরত খাদিজা (রঃ) এর ব্যবসায়িক সুদৃঢ় অবস্থানের কারণে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে অতি দ্রুত। তাঁর অবদানের কথা আল্লাহ্‌র নবী (দঃ) সদা স্মরণ করতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) শিক্ষকতা করতেন, যদিও তখনকার দিনে শিক্ষকতার পারিশ্রমিক প্রথা চালু হয়নি। অমুসলিম কর্তৃক মুসলমানরা আক্রান্ত হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের উপরও জিহাদের অংশ গ্রহণ করা ফরজ। আর জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে হলে তার কলা-কৌশল ও প্রশিক্ষণ নেয়া তো জরুরী। নারীদের জন্য ডাক্তারী পেশা ইসলামে স্বীকৃত। নারীদেরকে নারীরা চিকিৎসা করা উত্তম (হেদায়া)। এমনকি মহিলা ডাক্তার অনাত্মীয় পুরুষ রুগীর চিকিৎসা করতে পারবে (বুখারী)। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ) বলেন, "আমরা যুদ্ধ মাঠে মুজাহিদগণের নার্সিং ও সার্জারীর কাজ করতাম (বুখারী)।

ইসলাম নারীদেরকে কোন বৈধ পেশা থেকে বারণ করেনি, তবে নারীর ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দিয়েছে তা হল নারীর ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা বিধান। কারণ, প্রাক ইসলামী যুগে তাদেরকে শুধু ভোগ্য পণ্যের মতই ব্যবহার করা হত। ইসলামী আইনে তারা যেন শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার না হয়- সেদিকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এর ফলে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে, ব্যভিচার লোপ পেয়েছে এবং নারীর আর্থ-সামাজিক মুক্তি সুনিশ্চিত হয়েছে।

নারী-পুরুষ সমান অধিকার প্রসঙ্গ

'সমান অধিকার' কথাটি ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার না সম্মিলিতভাবে সমান অধিকার কল্যাণকর ও যুক্তিসঙ্গত- তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ঢালাওভাবে সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবী মানে এক ধরনের বোকামী। কারণ, লিঙ্গের ভিন্নতা যেমন সত্য তেমনি এর দায়িত্ব ও অধিকারের ভিন্নতাও বাস্তব সম্মত। 'নারী-পুরুষ সমান অধিকার' বলে যেমন কোন পুরুষের মাতৃত্বের অধিকার দাবী করা একান্তই অযৌক্তিক, এমন দাবী সর্বধর্মে যেমন অগ্রাহ্য তেমনি বাস্তবতার আলোকেও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত। ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপুরক। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নারীর প্রাধান্য। কোথাও নারীর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বেশি আবার কোথাও পুরুষের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব বেশি। এভাবে মোটের উপর নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা বললে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকারের কথা না বলে নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার কথাটি অধিক যুক্তি সঙ্গত বলা যায়। যারা নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবী এভাবে করেন যে, "আমার পুরুষ ভাইয়ের বেগ হলে যদি সে রাস্তায় বা যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগের অধিকার পায় অথবা গ্রীষ্মকালীন ঘরের ছাদে পরিবারের সবার সামনে গেঞ্জিসহ সবকিছু খুলে ফেলতে পারে তাহলে নারী বলে আমি পারব না কেন?" আসলে এ জাতীয় সমান অধিকার দাবী রুচিহীনতারই পবিচায়ক এবং অধিকারের কথা বলে তাদেরকে অপমানিত করার নামান্তর বৈকি। এমন যুক্তির অবতারণা করে যারা লেখালেখি করেন তারা কলমের পবিত্রতা নষ্ট করেন। মূলত ইসলাম ঢালাওভাবে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেনি। কারণ, সমান অধিকার বিষয়টি আপেক্ষিক। স্থান, কাল, অবস্থা, পাত্রভেদে অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা ভিন্ন হতে পারে। এ পর্যায়ে নারী-পুরুষকে আমরা চারভাগে মূল্যায়ন করতে পারি।

এক. সাধারণভাবে পুরুষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাই পুরুষের অধিকার বেশি- যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ পুরুষের মধ্য হতে এসেছেন এবং পৃথিবীর উন্নতি ও সৌন্দর্য্যের পেছনে পুরুষের অবদান বেশি। আবার একের উপর অন্যেকে, এক শ্রেণির উপর অন্য শ্রেণিকে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর প্রাধান্য দেয়া আল্লাহ্ তায়ালার অমোঘ বিধান। তবে প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। যেমন পৃথিবীর কোন অলি কোন মহিলা সাহাবীর সমান হতে পারবে না। একজন তাক্ওয়াবান মহিলা অবশ্যই পাপাচারী পুরুষ বা অপেক্ষাকৃত কম তাক্ওয়াবান পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের মাপ-কাঠি তাক্ওয়া বা খোদাভীতি, পুরুষত্ব বা নারীত্ব নয়। আবার ইসলামী শরীয়তে বিয়ের ক্ষেত্রে 'কুফু' বা পাত্র-পাত্রির মাঝে গুণগত সমতা বিবেচ্য বিষয়। কুফু ছাড়া বিয়ে জায়েয নয়। অর্থাৎ বংশ মর্যাদা, শিক্ষা-দীক্ষা, খোদাভীরুতা, আর্থিক অবস্থান ইত্যাদি পাত্র-পাত্রির সমতার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়। তাই যে কোন পুরুষ যে কোন নারীর যোগ্য হতে পারে না, যেমন যে কোন নারী যে কোন পুরুষের যোগ্য নয়।

দুই. নারী-পুরুষ মর্যাদা ও অধিকারে সমান- যেমন সন্তানের নিকট পিতা-মাতা উভয়ে সমান মর্যাদা ও অধিকার পাবে। উভয়ের সাথে অসদাচরণ কবিরা গুনাহ। আবার লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েকে সমতা বিধান করতে হবে। যেমন হাদীস শরিফে এসেছে, "যার একটি কন্যা সন্তান আছে, তাকে সে জীবন্ত কবরস্থ করল না, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করল না এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর প্রাধান্য দিল না, আল্লাহ্ তায়ালা তাকে জান্নাত দান করবেন।" (আবু দাউদ)

কারো কন্যা সন্তান হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না। কন্যা সন্তান হলে অসন্তোষ প্রকাশ করা জাহেলী যুগের পৌত্তলিকদের চরিত্র; যাদের পরিণতি খুবই নিকৃষ্ট বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা নাহাল এর ৫৯-৬০ তম আয়াত ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বামী যেমন স্ত্রীর নিকট অধিকার পাবে স্ত্রীও স্বামীর নিকট অধিকার পাবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে,"এবং স্ত্রীদের তেমনি ন্যায় সঙ্গত অধিকার রয়েছে স্বামীদের উপর, যেমন স্বামীদের আছে তাদের উপর।" (সূরা বাকারাঃ ২২৮)

ঈমান ও নেক আমলের সাওয়াবের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষ সমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, "নারী-পুরুষ যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তায়ালা তাদেরকে ওয়াদা দিচ্ছেন যে, তাদের জন্য ইহ-পরকালে রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার। (সূরা মায়েদাঃ ৯)

সুরা নাহাল এর ৯৬তম আয়াতে বলা হয়েছে, "যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক বা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব। এবং তাদেরকে তাদের উত্তম কাজ, যা তারা করত, তার প্রতিদান অবশ্যই দান করব।"

পবিত্র কুরআনে পুরুষ শব্দটি যত বার (২৪ বার) ব্যবহার হয়েছে তত বার নারী শব্দের ব্যবহার হয়েছে। আবার মিরাসের (উত্তরাধিকার) সম্পত্তিতে দশ অবস্থায় নারী পুরুষ সমান অংশ পাবে। যেমন, মৃত ব্যক্তির পুত্রসন্তান থাকলে পিতা-মাতা সমান অংশ পাবে।

তিন. নারীর মর্যাদা বেশি- কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীকে অধিক মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। তার কয়েকটি উদাহরণ নিম্নরূপ।

ক. নারী যখন মা হবেন তখন তার পুত্রের জন্য তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে মর্যাদাবান। যেমন বলা হয়েছে, "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত।" 'কে সবচেয়ে বেশি সদাচারণ পাওয়ার যোগ্য' এমন প্রশ্ন করা হলে আল্লাহ্র রাসূল (দঃ) বলেন, তোমার মা। এভাবে তিন বার প্রশ্ন করা হলে তিনি তিন বারই মায়ের কথা বললেন এবং চতুর্থবার পিতার কথা বললেন। অর্থাৎ সন্তান পুরুষ হলেও তার জন্য তার মা সর্বাধিক সম্মানের পাত্র।

খ. 'যাবিল ফুরূজ' বা যাদের অংশ পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে- এমন ১২ জনের মধ্যে ৮ জন নারী, বাকী ৪ জন পুরুষ। এভাবে কমপক্ষে বার অবস্থায় নারী পুরুষের চেয়ে বেশি অংশ পায়। যেমন, স্বামী থাকা অবস্থায় একমাত্র কন্যা পাবে অর্ধেক আর স্বামী পাবে এক চতুর্থাংশ। এমন কয়েকটি অবস্থা আছে যেখানে পুরুষ মাহরুম বা মিরাস থেকে বঞ্চিত হলেও তার সমমানের নারী আত্মীয় অংশ পায়। যেমন, স্বামী, বাবা, মা, মেয়ে ও নাতনী (ছেলের মেয়ে) থাকলে তাহলে নাতনী এক ষষ্ঠাংশ পাবে। পক্ষান্তরে বর্ণিত অবস্থায় যদি নাতনীর পরিবর্তে নাতী (ছেলের ছেলে) থাকে তাহলে সে কিছুই পাবে না। পবিত্র কুরআনে নারী সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি সূরা রয়েছে। পুরুষের নামে স্বতন্ত্র কোন সূরা নেই।

চার. পুরুষের প্রাধান্য- রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম পুরুষকে প্রাধান্য দিয়েছে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানই সর্বাধিনায়ক সেহেতু যুদ্ধ পরিচালনায়ও পুরুষের প্রাধান্য। এভাবে সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে চার অবস্থায় পুরুষকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সাধারণভাবে পরিবারের প্রধানও পুরুষ। তবে সন্তান-সন্ততির লালন-পালন, দেখা-শুনা ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাই প্রধান। নারী-পুরুষ এক সাথে নামায আদায় করলে পুরুষই ইমামতি করবে।

উপসংহার

ইসলাম মানবতার ধর্ম। সমগ্র মানবতার ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তিই ইসলামী বিশ্বাস ও অনুশাসনের মূল লক্ষ্য। তাই নারী-পুরুষের উভয় শ্রেণির যথাযথ অধিকার ইসলামে সুরক্ষিত। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়কে ক্ষেত্রবিশেষ প্রাধান্যের মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান বা ইসলামী সংগঠন নারী উন্নয়ন বিরোধী হতে পারে না। নারীরা সমাজের কোন না কোন পুরুষের মা, বোন, মেয়ে বা পরিবারের সদস্য। তাই নারী উন্নয়ন মানে পুরুষেরও উন্নয়ন। তবে নারীর উন্নয়নের নামে অযৌক্তিক, অপরিনামদর্শী, ও বৈষম্যমূলক নীতি প্রণয়ন, আন্দোলন, বক্তব্য প্রদান বা লেখা-লেখি সর্বক্ষেত্রে অগ্রাহ্য এবং সকলের জন্য অমঙ্গলজনক। যে ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে, তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছে, সর্বোপরি নারীকে মাতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে সন্তানের বেহেস্ত তাদের পদতলে মর্মে ঘোষণা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে নারী সমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলা বা নারী উন্নয়ন কর্মসূচীকে সাংঘর্ষিক করে তোলা সত্যিই দুঃখজনক। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য নারীর অধিকার, মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন ও তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন । খন্ডিত বা বিকৃতভাবে জ্ঞান অর্জন বা বাস্তবায়নের কারণেই নারীরা তাদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র বোধোদয়ের প্রত্যাশায়

'তাক্‌ফিরী গোষ্ঠীর প্রতিভু', 'মুন্‌কেরে আকীদায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত', 'গোস্তাখে গাউসুল আযম মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী' এবং 'মুন্‌কেরে হযরত বাবা ভাণ্ডারী' 'আল-মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিন ডেস্ক'র স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের বোধোদয়ের প্রয়োজনে–

'গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ' কর্তৃক প্রকাশিত আল মাইজভাণ্ডারী ম্যাগাজিনের 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' তাদের লেখনীসমূহে মাইজভাণ্ডরীয়া ত্বরিকার আক্বিদার খেলাফ যে বক্তব্যসমূহ প্রচার করেছে 'আলোকধারা'র বিগত সংখ্যায় আমরা তার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেছি। অপমানজনক ভাষায় এই ডেস্ক সমস্ত মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলকে আক্রমণ করেছে। ত্বরিকার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত শাহ্‌সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার 'অছি', 'নবাব', 'সুলতান' হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে, যিনি জীবনভর শরীয়তের আনুগত্য এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার খেদমতে নিবেদিত ছিলেন, তাঁকে এবং তাঁর লেখনীকে অস্বীকার করেছে। গীবত, অসত্য তথ্য, স্ববিরোধী এক অন্তসারশূন্য বক্তব্য দিয়ে এই ডেস্ক সমস্ত মাইজভাণ্ডারী পরিমণ্ডলকে বিচ্যুতি আর বিভ্রান্তির এক ভয়াবহ জটাজালে নিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করেছে।

অযাচিত, অনাকাংখিত এই মারাত্মক অন্যায় আচরণে আমাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত, মনীবের অশেষ মেহেরবানীতে ক্রোধ আমাদের গ্রাস করতে পারেনি, আক্রোশ আমাদের অন্ধ করেনি, প্রতিশোধস্পৃহা আমাদের তাড়িত করেনি, কোনরকমের গোষ্ঠি প্রীতি আমাদের চেতনা হরণ করেনি। তার জন্য আমরা শোকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

সত্যিকার অর্থে সময় এখন এমন, যখন সকলে মিলে ত্বরিকতের বিষয়গুলো আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে একটা মর্যাদাপূর্ণ সমাধানে উপনীত হওয়া প্রয়োজন। নির্ধারণ করা দরকার দেশ এবং বহিবিশ্বের আলোকে এ সময়কালে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার?

প্রকৃত অর্থে সারা বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপট, সামগ্রিকভাবে মুসলমানদের যে ত্রাহি অবস্থা, পাশাপাশি ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ, বিশ্বসন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সামগ্রিকভাবে মুসলমান সমাজকে যে জায়গায় নিয়ে এসেছে সেখানে বিশ্ব প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে বৃহত্তর পরিসরে তাসাওউফ ও ত্বরিকতের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা হয়েছে সেখানে এগুলোর পাশাপাশি সুন্নিয়তের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখার অগ্নি পরীক্ষার এই যুগসন্ধিক্ষণে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারী হিসেবে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র অবস্থান কোথায়?

ত্বরিকতের মিশন হিসেবে ঐতিহাসিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কি আর 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' কোথায়? কোন্ অবস্থানে?

যা করা বাঞ্ছনীয় ছিল তা না করে, 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' ত্বরিকতপন্থীদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করে প্রকারান্তরে ত্বরিকতের শত্রুদের সহায়তা করে চলেছে। আমরা আশা করি, এ ধরণের ভয়াবহ অবস্থা থেকে তারা নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মহান আর্দশকে সমুন্নত রাখার কাজেই নিজেদের নিবেদন করবেন।

সম্মানিত পাঠক, প্রিয় আশেকানে মাইজভাণ্ডারী, 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' মাইজভাণ্ডারী দাবীদার হয়েও অকল্পনীয় এবং অমার্জনীয়ভাবে খোদ হযরত গাউসুল আযম শাহ্‌সুফি মাওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর মর্যাদাকে অবলীলাক্রমে অস্বীকার করেছে এবং এর মাধ্যমে তাঁর গাউসিয়ত আযমিয়তের মহান সত্তার প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। উদাহরণগুলো আমরা একে একে তুলে ধরছি।

প্রথমতঃ 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' যেমনটি আমরা আগেই বলেছি ২২ চৈত্র ২০১৭ সংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠায় অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্‌সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, যিনি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা কাবার মনোনীত গদিনশীন সুলতান, তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেছে- **'তৎসময়ে তিনি স্থিরজ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার মত বয়সে পৌছাননি। এ সময়ে তাঁর দাদা হযরত গাউছুল আ'যম মাইজভাণ্ডারী (ক:) কর্তৃক উপদেশ বাণী তাঁর কার্যকর্ম উপলব্ধি করে মাইজভাণ্ডারী দর্শন জানা ও লেখার মত শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করেননি, বায়াত, মুরিদ খেলাফত অর্জনের কথা তো প্রশ্নই আসেনা'**। এবং তাদের বক্তব্যের সমর্থনে ২৯ আশ্বিন সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায় ১৮ বছর বয়সকে 'বুদ্ধি পরিপক্বে'র জন্যে (স্থিরজ্ঞান) বয়সসীমা হিসাবে উল্লেখ করে। অথচ এই ম্যাগাজিনের সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যগণের কারও কারও পক্ষ হতে প্রকাশিত 'কারামাতে গাউছুল আ'যম বাবাভান্ডারী (কঃ)' গ্রন্থের ১৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত: **'মহেশখালীর মাওলানা সৈয়দ মসউদুল করিম মধুপুরীকে (রহঃ) ১৫ বছর বয়সে বেলায়ত-খেলাফত দান করেছেন'** এবং 'ইমামুল আউলিয়া গাউসুল আ'যম মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাভাণ্ডারীর জীবনী ও কারামত' গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত: **'হযরত বাবাভাণ্ডারী বোয়ালখালী আহল্লা দরবার শরীফে অবস্থানকালে হালের চাষ ছেড়ে কর্দমাক্ত দেহে আগত শুককুর আলীকে মুহূর্তের মধ্যে খেলাফত দান করেছেন'**।

এখন চরম পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের পক্ষ হতে বেলায়ত প্রদানের জন্যে শিক্ষা-দীক্ষা ও বয়সসীমার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, কিন্তু হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শান-আযমতের পক্ষ হতে এই

ধরণের প্রকাশ ক্ষমতার প্রশ্নে তারা 'স্থির-জ্ঞান সম্পন্ন' নামক এক উদ্ভট বানোয়াট তত্ত্ব হাজির করেছে এবং এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে তারা স্পষ্ট করে বলেছে যে, বয়সের সীমাবদ্ধতার কারণে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে বেলায়ত প্রদান করতে পারেননি (নাউযুবিল্লাহ্)। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসুল আজমিয়তের শানের উপরে এটি চূড়ান্ত অবিশ্বাস এবং বেয়াদবী নয় কি?

দ্বিতীয়তঃ ২২ চৈত্র ২০১৭ সংখ্যার ১৯ পৃষ্ঠায় 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' লিখেছে, **'কাদেরীয়া ত্বরিকার খলিফা হিসেবে হযরত কেবলা (ক:) হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক:) আল কাদেরী নামে খ্যাত হন'**। এই বর্ণনাও আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক কর্তৃক হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসুল আজমিয়তের শানের উপরে এটি চূড়ান্ত অবিশ্বাস এবং চরম বেয়াদবীর আরেকটি উদাহরণ। কারণ খলিফায়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীগণ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবদ্দশায় 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী' লকবটি সর্বজনীন স্বীকৃতি হিসেবে লিখিত দলিল উপস্থাপন করেছেন একান্ত সম্মান ও মর্যাদা সহকারে। প্রমাণস্বরূপ মূল এবারতের দুটো ছবি নিচে উপস্থাপন করা হলো: (১) [মুফ্তিয়ে আযম সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (রহঃ) কৃত 'তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার – ফি দাফ্-ই-শারারাতিল আশ্রার' প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১০ আষাঢ় ১৪১৭ বঙ্গাব্দ-এর ১১ পৃষ্ঠার ছায়াচিত্র]:

তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার ১১ ফি - দাফ্-ই-শারারাতিল আশ্রার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنِّیْ اَلَّفْتُ هٰذَا الْكِتَابَ كَاشِفَ الْحِجَابِ بِمُسَمّٰى تُحْفَةُ الْاَخْيَارِ بِاِذْنِ مَنْبَعِ الْفُيُوْضِ وَالْبَرَكَاتِ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ حَضْرَتِ اَبُوالْوَقْتِ سُلْطَانِ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاَبْرَارِ قُطْبِ افْخَمِ غَوْثِ الْاَعْظَمِ مُنْجِبْهَنْڈَارِ فَانِىْ فِى اللّٰهِ بَاقِىْ بِاللّٰهِ مَوْلَانَا شَاهْ سَيِّدْ اَحْمَدْ اللّٰهْ قُدِّسَ اللّٰهُ تَعَالٰى رُوْحَهُ الْمُخْتَارِ بِاِرْشَادِ وَاجِبِ الْاِنْقِيَادِ اِبْنِيْهِ اَخِيْهِ الْاَبْرَارِ فَخْرِ الْاَوْتَادِ قُطْبِ الْاَقْطَابِ سُلْطَانِ الْكَامِلِيْنَ حَضْرَةِ مَوْلَانَا شَاهْ سَيِّدْ غُلَامُ الرَّحْمٰنِ الْمَعْرُوْفِ بِهٖ بڑے مولانا صاحب قبلہ اَدَامَ اللّٰهُ تَعَالٰى ظِلَالَهُمْ وَضَاعَفَ جَلَالَهُمْ وَجَمَالَهُمْ وَحَضْرَةِ فَخْرِ الْاَوْلِيَاءِ مُنْتَهٰى طَرِيْقِ الْعِرْفَانِ وَاصِلِ بِجَوَارِ الْحَقِّ بِمَقْعَدِ الصِّدْقِ الْحَقِّ مَوْلَانَا شَاهْ سَيِّدْ اَمِيْنُ الْحَقِّ الْمَشْهُوْرِ بِهٖ چھوٹے مولانا صاحب قبلہ رَحِمَهُ اللّٰهُ الْغَفَّارُ

বঙ্গানুবাদঃ তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার নামক পর্দাউন্মোচনকারী কিতাবখানা আমার মোরশেদ দ্বীন-দুনিয়া উভয় জগতের ফয়জাত ও বরকতের উৎস। আবুল ওয়াক্ত, আবরার ও অলিকুল সম্রাট, বিশ্ব অলি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী মাওলানা শাহ ছুফি ছৈয়দ আহমদ উল্লাহ ফানী ফিল্লাহ বাকী বিল্লাহ (কঃ) ছাহেবের অনুমতিক্রমে এবং তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র, যাঁহাদের আদেশ পালন একান্ত জরুরী তাঁহাদের নির্দেশ অর্থাৎ ফখরুল আওতাদ কুতুবকুল শিরোমণি কামেলীনগণের সুলতান জনাব বড় মাওলানা হজরত শাহ ছুফি ছৈয়দ গোলামুর রহমান (কু, ছি, আ,) এবং ফখরুল আওলীয়া আল্লাহ পাকের খাস দোস্তদের শিরোমণি সত্যের পথ প্রদর্শক জনাব ছোট মাওলানা শাহ ছুফি ছৈয়দ আমিনুল হক ওয়াছেল (রঃ) এর নির্দেশক্রমে উক্ত কিতাব খানি সম্পন্ন করিলাম। বিনীত গ্রন্থকার

(ছুফি পরিভাষায় যাহারা অবস্থা ও হাল জজবাতের পরিপ্রেক্ষিতে চলেন তাঁদিগকে ইবনুল ওয়াকত বলা হয়।) যাহারা হাল-জজবাত ও অবস্থার সংযম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাহে হুলুকের পথ প্রদর্শক তা'দিগকে আবুল ওয়াকত বলা হয়।

(২) বাহরুল উলুম সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (রহঃ) কৃত 'আয়নায়ে বারী ফি তরজুমাতি গাউসিল্লাহিল আযম মাইজভাণ্ডারী' প্রথম সংস্করণ, ১৩৩০ হিজরী, প্রচ্ছদসহ ১০ পৃষ্ঠার অংশবিশেষ:

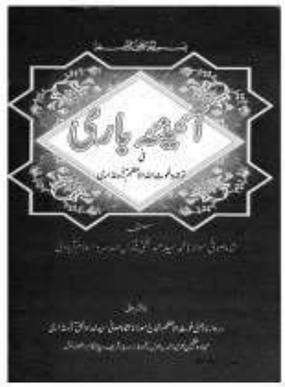

آئینہ باری فی ترجمۂ غوث اللہ الاعظم منجبھنڈاری ❖ ۱۰

خلیفۃ اللہ الاکرم ظلّ اللہ فی العالم غوث اللہ الاعظم سید احمد اللہ تعالیٰ المنجبھنڈاری رضی اللہ عنہ الباری کے دامنگیر رہتا تھا اور ان کے

'আল্লাহর সম্মানিত প্রতিনিধি গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী'

মূলত এটি ত্বরিকার প্রবর্তক এবং ইমাম হিসাবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর অবস্থানকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করার জন্য একটি ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্য।

এই ধরণের বক্তব্য তারা ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যায়ও এনেছে। এ সংখ্যায় আল-মাইজভাণ্ডারী ২১ পৃষ্ঠায় 'আয়নায়ে বারী' প্রসঙ্গে তারা লিখছে, **'এই গ্রন্থটির সকল অধ্যায় কোরআন হাদিছ ভিত্তিক নয়,** যার প্রায় সকল অধ্যায় হযরত আব্দুল গণি কাঞ্চন পুরী (রহ.) তিনি তাঁর স্বীয় মুর্শিদ গাউছুল আ'যম মাইজভান্ডারী (ক.) শান-মানের প্রশংসাই বেশী ভাগ আলোচিত যাতে তাঁর ভক্তি প্রেমের প্রকাশ লাভ করে'। হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী'র মহান খলিফার একটি গ্রন্থকে কুরআন-হাদিসভিত্তিক নয় বলে উল্লেখ করার দুঃসাহস কোন সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রকারী ব্যতীত কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা এ ধরণের অন্যায় অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করছি।

২০১৭ সালের ২২ চৈত্র এবং ২৯ আশ্বিন উভয় সংখ্যায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'খাতেমুল আউলিয়া'র মর্যাদাকে অস্বীকার করেছে এবং তার জন্য হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জমানায় কৃত্রিম পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ব্যাপক বিকাশ হয় বলে মন্তব্য করেছে। এবং এইমর্মে বাবা ভাণ্ডারীকে খাতেমুল আউলিয়া বলে সাব্যস্ত করেছে। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরীর গ্রন্থ যাঁকে তারাও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মূল দর্শন বলে গ্রহণ করে থাকে, তিনি তাঁর কিতাবে ৫৫ পৃষ্ঠায়- "হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারীকে খাতেমুল ওলী হিসেবে উল্লেখ করেন"। যেহেতু হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে 'খাতেমুল আউলিয়া' বলে একবাক্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সে ক্ষেত্রে এটিই হবে আমাদের ত্বরিকার আকিদা। মনগড়া অন্যকিছু

মন্তব্য করা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

তৃতীয়তঃ তাদের প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখি যে, আসলে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিষয়টি হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জমানার নয়, এটি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জমানায় ব্যাপক বিকাশ লাভ করে।

"জন্মনিয়ন্ত্রনের উপর বই প্রকাশ, গবেষণা, জন্মনিয়ন্ত্রনের 'ম্যালথাসিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হওয়া, জন্মনিয়ন্ত্রণের ফলে জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়া সবকিছু গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (কঃ) যুগে শুরু হয়েছিল (১৮৩২-১৯০০ সাল) এবং ঐ সময় অনেক বিজ্ঞানীকে কারাভোগ করতে হয়েছিল শুধু জন্মনিয়ন্ত্রনের উপর বই প্রকাশ, জনসচেনতা তৈরী করা, লীগ প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদির কারণে। এবং উল্লেখ্য যে গাউসুল আযম মাইজভান্ডারীর জন্ম ১৮২৬ সালে ও বেসাল ১৯০৬ সালে।

নিচে রেফারেন্স সহ বিস্তারিত দেওয়া হলঃ

১৮৩২ সালে সর্বপ্রথম জন্মনিয়ন্ত্রন-এর উপর বই প্রকাশ হয়, বইয়ের নাম The Fruits of Philosophy book, লেখকের নামঃ Charles Knowlton.

বইটি প্রকাশের জন্য বইয়ের লেখককে তিন মাসের কারাদণ্ড দিয়েছিল, দ্বিতীয় মামলায়, তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। এর পরে বইটি এত বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠে (বিচারের পর) এক বছরে বিক্রয় ১ হাজার থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার বেড়ে গেছে।

তারপর জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার উপর ১৮৭৭ সালে 'ম্যালথাসিয়ান লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণের শিক্ষা উন্নীত করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রবর্তকদের বিরুদ্ধে জরিমানা বাতিলের পক্ষে প্রচারণা চালায়।

এটি ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসে অ্যানি বেসান্ত এবং চার্লস ব্র্যাডলফের "নওলটন ট্রায়াল" এর সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "Knowlton trial" of Annie Besant and Charles Bradlaugh এরা গর্ভনিরোধের তথ্য প্রচারের আন্দোলনের সংগে জড়িত। চার্লস নওলটন-এর জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতির উপর দর্শনশাস্ত্র প্রকাশের জন্য তাদের বিচার করা হয়। ১৮৮০-এর দশকের শুরুতে, শিল্পজাত দেশগুলিতে জন্মগত হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস হতে শুরু করে, যেহেতু মহিলারা পরে বিয়ে করে এবং শহুরে জীবনযাত্রার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কম বাচ্চা থাকার প্রবণতা বেড়ে যায়। যুক্তরাজ্যে এই প্রবণতাটি বিশেষভাবে তীব্র ছিল, যেখানে ১৮৭০ সাল থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রজন্মের মধ্যে ২৯% হ্রাস পায়। কারণ জন্মনিয়ন্ত্রণ এর পদ্ধতি "ভিক্টোরিয়ান ওমেন" মেথড কার্যকর ছিল এবং এটা ব্যপক ব্যবহার করা হয়েছিল। অনেক মহিলা গর্ভনিরোধ সম্পর্কে এবং কিভাবে গর্ভাবস্থা এড়ানো যায় সেই বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিল। ১৯১৪ সালের দিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর ক্লিনিক স্থাপিত হয় এবং এ নিয়ে বিভিন্ন সেমিনারও হয়েছিল।

[সূত্রঃ উইকিপিডিয়া]

https://googleweblight.com/i?u=https%3A%2F%2Fen.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FHistory_of_birth_control&grqid=zX312VeQ&hl=bn-BD

প্রিয় পাঠক, হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীর শর্তের ভবিষ্যতবাণী বর্ণনার অনুকুলে ইতিহাসসম্মত সত্য হচ্ছে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জমানায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সূত্রপাত হওয়ার কারণে তিনি খাতেমুল ওলী এবং ইবনুল আরাবীর এই সাক্ষ্য হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর খলিফা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী 'আয়নায়ে বারী' কিতাবের (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৫৫ পৃষ্ঠায় সত্যায়িত করেছেন এইভাবেঃ

'বিকা তখ্‌তমুল বেলায়াহ্ তুজ্‌হে হী সে খতম কিযাবে গি মরতবায়ে বেলায়ত'

آئینہ باری فی ترجمہ غوث اللہ الاعظم مجھنڈاری ❖ ۵۵

اور ظل نبوت کی ہے اور صدیقیت کی مرتبہ مرتبہ نبوت کے نیچے ہے کہ ان دونوں مقاموں کے درمیان دوسرے کوئی مقام فاصلہ نہیں ہے اور اس کلام میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب سالک اس مقام کو پہونچتا ہے تو کل طریقوں کی جامع ہو جاتا ہے اور اس کو اختیار ہو جاتا ہے کہ جس طریقے میں طرق تقرب میں سے جسکو چاہے اور مناسب سمجھے ہدایت وارشاد کر سکتا ہے بلکہ یہ بھی اختیار ہے کہ چند طریقوں کو بہم ملا کر ایک طریقہ مرکبہ بناوے یا خود ایک نئی طریقہ حسب مصلحت دیدا پنے اجتہاد سے ایجاد کر کے بیماران قلب وروح کو اسکے مطابق چلاوے مانند طبیب حاذق کے کہ بیمار کے مرض کی لحاظ پر دوائے عملی کرتے ہیں بک تختم الولایۃ تجھہ ہی سے ختم کیجاوے گی مرتبہ ولایت کہ تیرے

এমতাবস্থায় এই প্রসঙ্গে অন্য যে কোন রকমের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বরঞ্চ হযরতের বেলায়তের মর্যাদার প্রতি অবমাননা ও অস্বীকৃতি হিসেবে বিবেচিত হতে বাধ্য।

অধিকন্তু, ২২ চৈত্র সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় হযরত কেবলার কালাম মর্মে তারা একটি বাক্য ব্যবহার করেছে, **'তুম লোগুকি এব্‌তেদা আওর এন্‌তেহা উনহি কে হাতমে হ্যায়'** অর্থাৎ **'তোমাদের প্রারম্ভ এবং পরিসমাপ্তি তাঁর হাতে ন্যস্ত'** করেছে। অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী শরীফে এই বক্তব্যটি ভিত্তিহীন এবং অসত্য বলে প্রমাণ করেছেন। আমাদের সাধারণ জ্ঞানও বলে, হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী'র খলিফাগণের শুরু এবং সমাপ্তি অন্য কারো হাতে ন্যস্ত হতে পারে না। উপরোক্ত

প্রমাণাদির প্রেক্ষিতে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি, উপরোক্ত বক্তব্যসমূহের মাধ্যমে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' বারংবার হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর শান-আযমতকে অবিশ্বাস করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এ সমস্ত বেয়াদবীপূর্ণ কর্মের ফলে 'গোস্তাখে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী' রূপে পরিগণিত হয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' ২২ চৈত্র ২০১৭ সংখ্যার ২৩ পৃষ্ঠায় 'সপ্ত পদ্ধতি' হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রবর্তিত দাবী করাকে 'চরম মিথ্যার পোষাক পরিয়ে দেওয়া হয়েছে' বলে অভিহিত করেছে। ২২ চৈত্র এবং ২৯ আশ্বিন উভয় সংখ্যায় নানান তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করে হযরতের এই মহান অবদানকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। অথচ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর মহান খলিফাদের মধ্যে সৈয়দ আমিনুল হক ফরহাদাবাদী তাঁর 'তোহ্ফাতুল আখইয়ার' এবং সৈয়দ আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী 'আয়নায়ে বারী'তে এই 'সপ্ত পদ্ধতি' তথা 'উসুলে সবআ'কে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই বক্তব্যের স্বপক্ষে 'তোহ্ফাতুল আখইয়ার' এবং 'আয়নায়ে বারী' থেকে তথ্যসমূহ আমরা নিম্নে তুলে ধরছি:

মুফ্তিয়ে আযম, সায়্যিদুল মুনাজেরীন, হযরত আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.) কর্তৃক রচিত একাধিক কিতাবের মধ্যে একটি কিতাব হলো "তোহফাতুল আখইয়ার"। এই কিতাবটি রচনার পর তিনি তা গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র দরবারে পেশ করলে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর রচনায় আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন এবং উক্ত রচনার সত্যতা স্বরূপ তাতে দস্তখত করেন। দুই খণ্ডে বিন্যস্ত উক্ত কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে বিশেষত তাযিমী সিজদার ফতোয়া রচনার পাশাপাশি তিনি "উসূলে সাব'আ" বিষয়ে আলোকপাত করেন। যার ভাবানুবাদ এইরূপ: "সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন সপ্ত কর্মপদ্ধতির সহিত আমাদের শতেক উরুজের রাস্তা রহিয়াছে। নফ্সের বিনাশ এবং লতিফায়ে কলবের শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মশুদ্ধি সংঘটিত হয়।" [সূত্রঃ 'তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার – ফি দাফ্-ই-শারারাতিল আশ্রার' ২য় খন্ড, ষষ্ঠ প্রকাশ, ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ বাংলা পৃ. ৬৩ (প্রমাণস্বরূপ মূল এবারতের ছায়াচিত্র নিচে উপস্থাপন করা হলো)]

তোহ্ফাতুল আখ্ইয়ার

সুস্থতা কলবের সুস্থতার প্রতিফলন যাহা হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে। ছুফীয়ায়ে কেরামগণ উহাকে ফানায়ে কলব বলিয়া থাকেন। বেলায়ত বা আধ্যাত্মিক সাধনা ফানায়ে নফছের প্রতিফলণ। ছুফিয়ায়ে কেরামগণ বলেন, সপ্ত কর্ম পদ্ধতির সহিত আমাদের শতেক উরূজের রাস্তা রহিয়াছে। নফছের বিনাশ এবং লতীফায়ে কলবের শুদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আত্মশুদ্ধি সংঘটিত হয়। তক্বওয়া বা পরহেজগারীর সহিত অতিরিক্ত নফল ইবাদতের কোন সম্পর্ক নাই। ওয়াজেব কাজ করিলে, নিষেধ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিলে, খ লুছিয়ত বা একাগ্রচিত্ত ব্যতীত ফরজ ওয়াজেব আদায় করিলেও তার্কওয়া বা পরহেজগারী অর্জ্জন হইবেনা। আল্লাহ্ পাক বলেন, "ধর্মে একাগ্রচিত্ততা বা খলুছিয়তের সহিত আল্লাহ্র ইবাদতে রত হও।" ফানায়ে নফছ ব্যতীত নিষেধ কাজ হইতে বাঁচিবার কোন উপায় নাই। সুতরাং বেলায়ত বা আধ্যাত্মিক

"মৃত্যু দুই প্রকার। যথা ১. এজতেরারী (বাধ্যতামূলক মৃত্যু) ২. এখতেয়ারী (ইচ্ছামূলক মৃত্যু) 'এখতেয়ারী মৃত্যু' গ্রহণকারীগণের ইহাই আবশ্যক যে, মউতে আবয়াজ (সাদা মৃত্যু), আসওয়াদ (কালো মৃত্যু), আহমর (লাল মৃত্যু), আখজার (সবুজ মৃত্যু) - এই চার প্রকারের মৃত্যুকে গ্রহণ করা।" (সূত্রঃ আয়নায়ে বারী, ২১৭ ও ২১৮ পৃ.)

(প্রমাণস্বরূপ মূল এবারতের ছবি নিচে উপস্থাপন করা হলো)

پہلے موت ابیض یعنی سفید وہ ہمیشہ بھوکا رہنے کو کہتے ہیں دوسری موت اسود یعنی سیاہ کہ کہ
عوام جوان کی شکایت کریں اوران کو رنج وایذا دیں سو وہ تحمل کرے تیسرے موت احمر یعنی
سرخ کہ خلاف خواہش نفس امارہ اور شیطان مزین کے کام کرے چوتھی موت اخضر یعنی

آئینہ باری فی ترجمہ غوث اللہ الاعظم مجیبھنڈاری ❖ ۲۱۸

سبز سو پیوند کے کپڑے پہنے لباس فاخرہ نہ پہنے اگر اس لباس سے شہرت مقصود نہ ہو حق تو یہ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্মানিত পাঠক আপনারা বুঝতেই পারছেন। উক্ত দু'টি কিতাবের প্রথমটি (তোহফাতুল আখইয়ার ১৯০৬ সালে) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) (১৮২৬-১৯০৬)'র জীবদ্দশায় এবং দ্বিতীয়টি (আয়নায়ে বারী) এর কয়েক বছর পরে ১৯১০ সালে প্রকাশিত। পক্ষান্তরে "বেলায়তে মোতালাকা" প্রকাশিত হয় এরও ৫০ বছরের অধিককাল পর ১৯৬০ সালে।

আমাদের সনির্বন্ধ আহ্বান, আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক 'সপ্ত পদ্ধতি'সহ বেলায়তে মোতলাকার বিরুদ্ধে আনীত সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত বিতর্কিত মন্তব্যসমূহ প্রত্যাহার করা হউক।

আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক ২২ চৈত্র সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠায়, 'তাওহীদে আদিয়ান' মতবাদকে অস্বীকার করেছে।

বেলায়তে মোতলাকায় উল্লিখিত, ***"যত রকমের ধর্ম আছে মূলত অভিন্ন ..."*** এই চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি প্রদান করেছে। আমাদের জানামতে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' মাওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনীকে একজন খাঁটি মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী আহমদিয়ুল কাদেরী উনার 'প্রেমের হেম' গ্রন্থে লিখেছেন,

এক বিনা দ্বিতীয় নাস্তি, সকল ধর্মের একই তত্ব।
ব্রহ্ম জ্ঞানে জ্ঞানী যারা, জানতে পারে বিশেষত্ব।
বহুরূপে একই রূপ, যে না দেখে সে বেকুপ।
বহুরূপে একের খেলা, বহুব্যাপী তার অস্তিত্ব।
বহুরূপে বহু সাজে, সদা তোমার কাছে রাজে।
বহুদূর বলে তুমি, ভ্রম ভাবে আছে মত্ত।

বহু না হইলে লয়, আছেরে তোর বহু ভয়।
বহুভাবে কোথা পাবে, তৌহিদ অর্থে একত্ব।
বহু পাপ বহু পূণ্য, মাত্র বহুবাদীর জন্য।
যে হ'ল একত্ববাদী, সে হয়েছে চির মুক্ত।
গুরু পদাশ্রয় ধর, তৌহিদ নির্ণয় করা।
জীবনের কর্তব্য বটে, এতে পাবে অমরত্ব।
করিমের কেবলা কাবা, মাইজভাণ্ডারী মাওলা বাবা।
চির শান্তি পেয়ে গেছে, যে নিয়েছে তার দাসত্ব।

কবিয়াল রমেশ শীল লিখেছেন,

'হিন্দু, মুছলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, সকল ধর্মের একই কথা।
নীতি রদ বদল মাত্র, গন্তব্য স্থান দুইটি কোথা'।

সকল ধর্মের একই তত্ত্ব বিষয়ক যে বর্ণনা বজলুল করিম মন্দাকিনী আর রমেশ শীল ব্যক্ত করেছেন তা অহোরাত্র প্রচার করে আসছে আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক। অথচ একই তত্ত্ব যখন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী প্রচার করেন তখন কেন আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক কুফুরী ফতোয়া আরোপ করে? আমরা এহেন স্ববিরোধী বক্তব্য ও মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং একইসাথে পাঠক সমাজকে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র স্ববিরোধী বিভ্রান্তিকর লেখা বিষয়ে ভবিষ্যতেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন একই তত্ত্ব প্রচারের কারণে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর বিরুদ্ধে তারা কুফুরী ফতোয়া প্রদান করলেন কেন? মূলত তাওহীদে আদিয়ান প্রশ্নে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' 'বেলায়তে মোতলাকা'র বিকৃত সমালোচনা করেছে।

২২ চৈত্র ২০১৭ সংখ্যার ২১ পৃষ্ঠায় তারা লিখেছে, ***'মানবের রুচি অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে, ইহার নাম ধর্ম স্বাধীনতা। ... অনুমোদনকে স্বীকার করেননি'***। কিন্তু ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠায় তাদের অবস্থান বদল করে লিখছে, ***'স্ব-স্ব রুচিমত ধর্ম পালনের এখতেয়ার কাফের মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য। দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাদের স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছেন তারা ইচ্ছা অনুসারে ধর্ম কর্ম পালন করতে এবং নবী (দ.) কে তাদের হক ধর্মের প্রতি আনয়নে জবর দস্তি করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে'***।

'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' আপনাদের ধন্যবাদ। অন্তত অর্ধেক সত্য মেনে নিয়েছেন। পুরো মানব জাতির পরিবর্তে অন্ততপক্ষে স্ব স্ব রুচিমতো ধর্ম পালনের এখতেয়ার কাফির-মুশরিকদের জন্য প্রযোজ্য মর্মে স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানবজাতিকে সত্য এবং মিথ্যা উভয় পথ প্রদর্শন করেছেন। এবং 'সীমিত স্বাধীনতা দিয়ে দায়িত্বশীলতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্রও উন্মুক্ত করে রেখেছেন'।

এই প্রসঙ্গে উইকিপিডিয়ায় বর্ণিত সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতের টীকাভাষ্য আমরা 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র বোধোদয়ের নিমিত্তে উপস্থাপন করছি:

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'লা ইক্‌রা ফিদ্‌দ্বীন' অর্থাৎ 'ধর্মে কোন বাধ্যবাধকতা নেই - এই নীতি শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব ধর্ম-স্বাধীনতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ইসলাম ধর্মে অমুসলমানদের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক অধিকারও প্রদান করা হয়েছে'।

Verse (ayah) **256 of** Al-Baqara is a well-known verse in the Islamic scripture, the Qur'an. The verse includes the phrase that "there is no compulsion in religion". Immediately after making this statement, the Qur'an offers a rationale for it: Since the revelation has, through explanation, clarification, and repetition, clearly distinguished the path of guidance from the path of misguidance, it is now up to people to choose the one or the other path. This verse comes right after the Throne Verse.

The overwhelming majority of Muslim scholars consider that verse to be a Medinan one, when Muslims lived in their period of political ascendance, and to be non abrogated, including Ibn Taymiyya, IbnHYPERLINK "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_Qayyim_al-Jawziyya" HYPERLINK "https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ibn_Qayyim_al-Jawziyya"Qayyim, Al-Tabari, Abi Ubayd, Al-Jas, Makki bin Abi Talib, Al-Nahhas, Ibn Jizziy, Al-Suyuti, Ibn Ashur, Mustafa Zayd, and many others. According to all the theories of language elaborated by Muslim legal scholars, the Qur'anic proclamation that 'There is no compulsion in religion. The right path has been distinguished from error' is as absolute and universal a statement as one finds, and so under no condition should an individual be forced to accept a religion or belief against his or her will according to the Quran.

The meaning of the principle that there is no compulsion in religion was not limited to freedom of individuals to choose their own religion. Islam also provided non-Muslims with considerable economic, cultural, and administrative rights.

আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক ২২ চৈত্র ১৯ পৃষ্ঠায় এবং ২৯ আশ্বিন সংখ্যার ২৪-২৫ পৃষ্ঠায় 'নক্শবন্দী-মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকা'র সাথে 'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা'র সম্পর্কের প্রশ্নে বিভিন্ন রকমের বিভ্রান্তিকর ত্বরিকতনীতি বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন করেছে। ত্বরিকতের সর্বজনীন নীতিমালা অনুযায়ী সমস্ত ত্বরিকাই একে অপরের সহযোগী এবং পরিপূরক। আমল ও আকিদার মধ্যে কিছু অমৌলিক পার্থক্য থাকলেও চার মাযহাবের মতো করেই প্রত্যেকটি ত্বরিকায় একে অপরের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মানুষকে সত্যের পথ দেখানোর দায়িত্বটি পালন করে এসেছে এবং একাধিক পীরের হাতে বায়াত গ্রহণ এবং খেলাফত গ্রহণের নজির ত্বরিকাসমূহে মোটেও বিরল নয়। চলমান এই সহজ সত্যটিকে আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক তার বক্তব্যের মাধ্যমে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অস্বীকার করেছে। কাদেরিয়া, চিশ্তিয়া, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাথে নক্শবন্দিয়া-মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকার সম্পর্ক 'সাংঘর্ষিক' বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কাদেরিয়া চিশ্তিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় একাধিক পীরের হাতে বায়াত হওয়া বৈধ নয় বলেছে। কাদেরিয়া চিশ্তিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় বায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিপরীত ত্বরিকতনীতির দিকে হাত বাড়ানো অগ্নিকুন্ডে প্রাণ বিসর্জন বলে উল্লেখ করেছে। এই ধরণের বানোয়াট ত্বরিকত পরিপন্থী বক্তব্য দিয়ে তারা ত্বরিকতের বৈশিষ্ট্যকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রমাণ স্বরূপ শুধুমাত্র দু'টি বিষয়ে আমরা পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে চাই। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর জীবনীতে নক্শবন্দী-মোজাদ্দেদিয়া ত্বরিকার খলিফা কুমিল্লার ঘিলতলা দরবারের মাওলানা বেশারত আলী শাহকে হযরত বাবা ভাণ্ডারী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় খেলাফত দিয়ে **'জামেউত্ তুরুক'** উপাধি দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকা এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গাউসুল আযম বাবাভাণ্ডারী (ক:) পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত, অধ্যাপক শাহ আহমদ নবী গরিবী মাইজভাণ্ডারী কর্তৃক লিখিত "ইমামুল আউলিয়া গাউছুল আ'যম মাওলানা সৈয়দ গোলামুর রহমান আল-হাসানী ওয়াল হোসাইনী আল্-মাইজভাণ্ডারী (ক:) (প্রকাশ বাবাভাণ্ডারী)'র পবিত্র জীবনী ও কারামত" গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় বিভিন্ন ত্বরিকার সমন্বয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বর্ণনা প্রসঙ্গে নক্সবন্দীয়া এবং মোজাদ্দেদীয়া ত্বরিকার নাম উল্লেখ করেছেন মর্যাদাপূর্ণভাবে–

তিনি প্রকৃত নায়েবে রাসূল হিসেবে মানব জাতিকে ধর্ম সাম্যের আদলে একেশ্বরবাদের (তাওহিদের) প্রতি আহ্বান জানালেন। মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে কাদেরিয়া, ওয়ায়েসিয়া, চিশতীয়া, রেফাইয়া, নক্সবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া, কলন্দরীয়া, মৌলবীয়া, মোজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি ত্বরীকার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ও যুগোপযোগী মহাসাগর রূপী ত্বরীকায়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ও মাইজভাণ্ডারী দর্শন প্রবর্তন করেন।

অথচ, হযরত বাবা ভাণ্ডারীর অনুসারী দাবী করে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' বাবা ভাণ্ডারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ন এবং প্রশ্নবিদ্ধ করেছে - হযরত বাবা ভাণ্ডারীর হেকমতি নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করেছে ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে। এবং এ বক্তব্যের ভিতর দিয়ে দিয়ে 'আল-মাইজভাণ্ডারী' কর্তৃপক্ষ 'মুন্কেরে বাবা ভাণ্ডারী' হিসেবেও চিহ্নিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ একাধিক পীরের হাতে বায়াত এবং খেলাফত গ্রহণ প্রসঙ্গে ত্বরিকতের উসুল বুঝার সুবিধার্থে আমরা প্রথমতঃ সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীর **'নসব আল খিরকা'** কিতাবের সূত্রে তিনি যাঁদের হাতে বায়াত এবং খেলাফতের খিরকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের পবিত্র নামগুলো লিপিবদ্ধ করছি: (১) শেখ জামাল উদ্দিন ইউনুস বিন ইয়াহইয়া বিন আবুল হাসান আল আব্বাসী আল কাস্সার (২) শেখ আবু আবদুল্লাহ্ মোহাম্মদ বিন কাসিম বিন আবদুর রহমান বিন আবদুল করিম আত্ তামীম (৩) শেখ তাকীউদ্দিন আবদুর রহমান বিন আলী বিন মাইনুন বিন আবু আল তাওজারী (৪) শেখ আবুল হাসান আলী বিন আবদুল্লাহ্ ইবনে জামী (৫) হযরত খিযির (আঃ)।

পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য, হযরত পীরানে পীর সাহেবের পীর ছিলেন দুইজন: (১) হযরত আবুল খায়র হাম্মাদ বিন মুসলিম বিন ওরদাদ আল দাব্বাস ও (২) হযরত শেখ আবু সাঈদ মখযুমী [সূত্র: (ক) নুফহাতুল উনুস পৃ. ৭৫৭, ৭৫৮ (খ) কালায়িদুজ্ জাওয়াহের ফী মানাকেবে শেখ আবদুল কাদের পৃ. ৫১, ৫২]।

মুন্কেরে আক্বিদায়ে আহলে সুন্নাহ্

'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' ইসলামী আক্বিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ গ্রন্থের লেখক মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীনের প্রেসক্রিপশানকে মডেল ধরে অগ্রসর হওয়ার যে পদযাত্রা শুরু করেছে তা হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের জন্য এক মারাত্মক অশনিসংকেত।

কারণ মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীনের ৭১৮ পৃষ্ঠার পুরো গ্রন্থটার উল্লেখযোগ্য অংশই সুন্নীয়তের বিশ্বাসের পরিপন্থী নানা ভ্রান্ত মতবাদে ভরপুর। সবচেয়ে বড় কথা, আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আকিদার মৌলিক ভিত্তি নবী আখেরুজ্জামান এর শান মান বিষয়ে (নবুয়ত, তাঁর ওয়াসিলা, তাঁর বেলায়ত, ত্বরিকত ইত্যাদি) বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করে মহানবী (সাঃ)কে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালিয়েছে বিভিন্নভাবে।

আকিদাগতভাবে সুন্নীয়তের অনুসারী হিসেবে 'আল-

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

"শিশু-কিশোরদের দরবারে আনা-নেওয়া ভাল। এতে তাদের আদব আখ্‌লাক বুঝ জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে"

-বিশ্বঅলি শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ)

নানানভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবা রাত্র

মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রবর্তক
গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌সুফি

সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)'র

বার্ষিক উরস্‌ শরিফ

উপলক্ষে

১১তম

শিশু কিশোর সমাবেশ

ও

পুরস্কার বিতরণী

নাসিরাবাদ সরকারি (বালক) উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ

নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

১৯ জানুয়ারি ২০১৮, শুক্রবার সকাল ৯.৩০টা

প্রতিযোগিতার বিষয়

ক্বিরাত, হামদ, না'ত, মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, কবিতা/ছড়া আবৃত্তি, চিত্রাংকন, উপস্থিত বক্তৃতা এবং কুইজ প্রতিযোগিতা

প্রতিযোগিতার বিভাগ

ক বিভাগ : প্লে-২য় শ্রেণি
খ বিভাগ : ৩য়-৫ম শ্রেণি
গ বিভাগ : ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি
ঘ বিভাগ : ৯ম-এস.এস.সি/সমমান

ফরম প্রাপ্তি ও জমা দেয়ার ঠিকানা

গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম
মাইজভাণ্ডারী একাডেমি কার্যালয়, গাউসিয়া হক ভাণ্ডারী খানকাহ্‌ শরিফ, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম
শিল্পকলা একাডেমি (শফির দোকান), এম.এম. আলী রোড, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, চট্টগ্রাম জেলা কার্যালয়, মিমি সুপার মার্কেট সংলগ্ন
বুকমার্ক, চেরাগীপাহাড় মোড়, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম
বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম

মাইজভাণ্ডারী একাডেমি

গাউসিয়া হক মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার শরিফ, চট্টগ্রাম

www.facebook.com/মাঘ উৎসব-শিশুকিশোর সমাবেশ
০১৬৮০-১৫৫৬৮৬, ০১৮১৯-৩২৪২০১

মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' সুন্নীয়তের ঝাণ্ডা উর্ধে তুলে ধরায় যেখানে তাদের পবিত্র ঈমানী দায়িত্ব, সেখানে ফতোয়া বিষয়ে 'ওহাবী' 'সুন্নী' কোন ভেদাভেদ না দেখার মানসিকতা "ফতোয়া প্রদানকারী কে সুন্নী? কে ওহাবী তা বিবেচনার বিষয় নয়।" (আল-মাইজভাণ্ডারী ২৯ আশ্বিন ২০১৭ সংখ্যা পৃ. ২০) প্রকারান্তরে সুন্নীয়তের আবরণে ওহাবী মতবাদ প্রচারেরই নামান্তর।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের লাখো আশেক ভক্তের মাধ্যমে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র প্রতি সোজাসুজি প্রশ্ন হলো, এ জগতে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের এত বিজ্ঞ অভিজ্ঞ আলেম উলামা থাকা সত্বেও কেন তারা নবীজী ও সুন্নীয়তের তীব্র সমালোচক ও বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারী মাওলানা হেমায়েত উদ্দীনের প্রেসক্রিপশন মতে চলছেন? এর অন্তর্নিহিত রহস্য কি?

আমাদেরও মূলকথা প্রশ্ন- সুন্নীয়তের একটি বিষয়, সুন্নীয়ত ঘরানার মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আকরগ্রন্থ 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থ বিষয়ে যেখানে সুন্নী জামাতের ইমাম, মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন সেখানে সুন্নীয়ত ঘরানার অনুসারী হয়ে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' বাতেল ফেরকার মাওলানা হেমায়েত উদ্দীনের প্রেসক্রিপশন অনুসরণ করে শেরে বাংলা হুজুরকে অপমান করে নিজেদের সরাসরি 'মুন্‌কেরে আহলে সুন্নতে' পরিগণিত করেছে।

একইসাথে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' ইমামে আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাতের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চলের সম্মানিত সভাপতি মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলা (রহঃ)কে 'কতিপয় আলেম' বলে যেভাবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে, তা কোনমতেই সুন্নী আকিদার আশেক-ভক্তগণ মেনে নিতে পারেনা। বলাবাহুল্য, 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' যদি সুন্নীয়তের দাবী করে থাকেন তাহলে এহেন আদবের বরখেলাফের জন্য তাদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সভাপতি মাওলানা আজিজুল হক শেরে বাংলার উচ্ছসিত প্রশংসা আবার 'মুন্‌কেরে আহলে সুন্নাহ্' মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন ও তার ভাবশিষ্য 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' 'বেলায়তে মোতলাকা'র তীব্র সমালোচনায় তাত্ত্বিকভাবে আমরা এ উপসংহারে পৌঁছতে পারি যে, 'বেলায়তে মোতলাকা' গ্রন্থটিই 'সুন্নী আকিদার অনুসরণে মাইজভাণ্ডারী দর্শনের আকর গ্রন্থ'। এবং একমাত্র এ কারণে বাতেল ফেরকার লোকজন এর পেছনে উঠে পড়ে লেগেছে। সত্য মিথ্যা মিলিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আর দুঃখজনকভাবে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' তাত্ত্বিকভাবে নিজেদের দিগদর্শনের অভাবে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ডুবে এবং একইসাথে গোলকধাঁধার চোরাগলিতে ঢুকে পড়ে বাতেল ফেরকার অন্ধকুপে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সুন্নি আকিদার অনুসারী মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার সাধনার এক উল্লেখযোগ্য অনুষঙ্গ মাইজভাণ্ডারী গান এবং সেমা। আর এই মাইজভাণ্ডারী গানের আদি রচয়িতা হলেন মাওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী। 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র সাথে সম্পর্কিত জনেরা দরবারী এবং পারিবারিক সূত্রে মাওলানা হাদীর অনুসারী এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকও বটে। আর মাইজভাণ্ডারী সেমাতো মাওলানা হাদীকে বাদ দিয়ে কল্পনাও করা যায় না। তাঁর 'দমে দমে জপরে মন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' গানটি মাইজভাণ্ডারী সেমার 'উদ্বোধনী গান' বলে অবিসংবাদিতভাবে স্বীকৃত ও অনুসরণীয়। অথচ মাওলানা হেমায়েত উদ্দীনের গ্রন্থের ৫২৭ পৃষ্ঠায় মাওলানা হাদীর গানেরই (রত্নভাণ্ডার গ্রন্থ) সমালোচনা করা হয়েছে তীব্র ও তীর্যকভাবে। অথচ এ ক্ষেত্রে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' কোন প্রশ্নই উত্থাপন করেনি, শুধু তাই নয়, আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন পদক্ষেপও নেয়নি। রহস্য কোথায়? মাইজভাণ্ডারী আশেক ভক্তগণ জানতে চায়।

আমরা শুরুতে যে কথাগুলো বলেছি, পরিশেষে সেগুলোই আরেকবার উল্লেখ করে এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই –

'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র অযাচিত, অনাকাংখিত এই মারাত্মক অন্যায় আচরণে আমাদের অন্তরে রক্তক্ষরণ হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমত, মনীবের অশেষ মেহেরবানীতে ক্রোধ আমাদের গ্রাস করতে পারেনি, আক্রোশ আমাদের অন্ধ করেনি, প্রতিশোধস্পৃহা আমাদের তাড়িত করেনি, কোনরকমের গোষ্ঠি প্রীতি আমাদের চেতনা হরণ করেনি। তার জন্য আমরা শোকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ্।

পাঠক! সচেতন সতর্কতার সাথে আমরা 'গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ'সহ সকল আশেকানে মাইজভাণ্ডারীর সম্মুখে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' এর এই বক্তব্য সমূহ যে 'ভয়ানক পরিনাম' ডেকে নিয়ে আসছে তার চালচিত্র তুলে ধরছি সংশোধন এবং বোধোদয়ের প্রয়োজনে। আমরা বিশ্বাস করতে চাইনা যে **'গাউসুল আযম বাবা ভাণ্ডারী পরিষদ' এবং কোন সচেতন মাইজভাণ্ডারী এই ধরণের অযৌক্তিক, আত্মমর্যাদা হানিকর, অবিমৃষ্যকারী বক্তব্যকে ধারণ করেন, লালন করেন অথবা সমর্থন করেন**। আমরা আশা করি, সচেতন মহলের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে এবং যে সমস্ত উপাদান এই ভয়ানক কর্মের জন্য দায়ী তা সুচিন্তিতভাবে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত হবে এবং নিজেদের অস্তিত্বের প্রশ্নে সকলেই ভবিষ্যতে এই ধরণের আত্মঘাতি কর্ম থেকে নিবৃত হবে। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

যাই হোক, 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর বেলায়ত সহ মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার বিভিন্ন বিষয়ে অসত্য ও অন্যায্য অভিযোগের যে আয়োজনের তালিকা উপস্থাপন করেছে তার প্রতিটির পিছনে ধাওয়া করা, তার প্রতিটির জওয়াব প্রদান আমরা অপ্রয়োজনীয় মনে করি। **'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক' কর্তৃক উত্থাপিত মৌলিক ভ্রান্তিসমূহের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ উপস্থাপনের ভেতর দিয়ে এ যাত্রায় এই বিতর্ক থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে 'আল-মাইজভাণ্ডারী ডেস্ক'র বোধোদয়ের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে চাই।**

উপমহাদেশের প্রখ্যাত অধ্যাত্ম সাধক ও বাংলাদেশে প্রবর্তিত ত্বরিকা, ত্বরিকা-ই-মাইজভাণ্ডারীয়া'র প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্‌সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (কঃ)-এর ১১২তম উরস্ শরিফ উপলক্ষে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর উদ্যোগে

১০ দিনব্যাপী কর্মসূচি

তারিখ ও বার	অনুষ্ঠান	ব্যবস্থাপনায়
৩০ পৌষ ১৩ জানুয়ারি শনিবার	১৬ পর্বে যাকাত বিতরণ কর্মসূচি ভেন্যু: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন। সকাল ১০টা।	যাকাত তহবিল পরিচালনা পর্ষদ
	সেমিনার: মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার রূপরেখা : তত্ত্ব ও বাস্তবতা ভেন্যু: চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তন। বিকাল ৫টা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
২ মাঘ ১৫ জানুয়ারি, সোমবার	আন্তঃ ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মিলন - ভেন্যু: থিয়েটার ইন্‌স্টিটিউট চট্টগ্রাম বিকাল ৫টা। বিষয়: বিশ্ব সংকট মোকাবেলায় আন্তঃধর্মীয় সংলাপের গুরুত্ব	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
৩ মাঘ ১৬ জানুয়ারি, মঙ্গলবার	মহিলা মাহ্‌ফিল- ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম। বিকাল ৩টা। বিষয়: ধর্মীয় দৃষ্টিতে সুদ, ঘুষ ও ফ্যাশন	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
৪ মাঘ ১৭ জানুয়ারি, বুধবার	উলামা সমাবেশ। ভেন্যু: মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট হল। বিকাল ৪টা বিষয়: 'তাসাওউফে ইসলামী ও মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা' 'সুন্নীয়ত প্রচারে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অবদান'	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
৫ মাঘ ১৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার	শিক্ষক সমাবেশ - ভেন্যু: মাইজভাণ্ডার শরিফ। সকাল ১০টা বিষয়: 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব' 'বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও নীতি নৈতিকতা চর্চা'	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
	'The Message' কর্তৃক আয়োজিত মহিলা মাহফিল। বিকাল ৩টা বিষয়: 'ইসলামে নারীদের অবদান' ভেন্যু: 'তাভা কনভেনশন হল'।	দি মেসেজ
৬ মাঘ ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার	১১তম শিশু-কিশোর সমাবেশ ও পুরস্কার বিতরণী ভেন্যু: নগরীর নাসিরাবাদ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়। সকাল ৯টা।	মাইজভাণ্ডারী একাডেমি
	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রিয় পর্ষদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব এলাকার মসজিদে কুরআন তেলাওয়াত ও মিলাদ মাহফিল।	মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ
৭ মাঘ ২০ জানুয়ারি, শনিবার	২০১৭ পর্বে মেধাবৃত্তি প্রাপ্তদের মাঝে বৃত্তির অর্থ প্রদান অনুষ্ঠান। সকাল ১১টা ভেন্যু: এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট মিলনায়তন, বিবিরহাট, চট্টগ্রাম।	বৃত্তি তহবিল পরিচালনা পর্ষদ
৮ মাঘ ২১ জানুয়ারি, রবিবার	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের র‍্যালী ও আলোচনা। সকাল ৯টা।	সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ
৯ মাঘ ২২ জানুয়ারি, সোমবার	ফটিকছড়ি উপজেলার রেজিস্টার্ড এতিমখানায় ছাত্র-ছাত্রীদের একবেলা খাবার সরবরাহ।	গাউসিয়া হক মন্‌জিল
১০ মাঘ ২৩ জানুয়ারি, মঙ্গলবার	জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বলিত দুর্লভ চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী, উপদেশমূলক, দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রচার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট
১১ মাঘ ২৪ জানুয়ারি বুধবার	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি: প্রধান সড়ক হতে হযরত সাহেব কেবলার পুকুর পাড়। সকাল ৭টা।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্‌জিল

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (কঃ) ট্রাস্ট
(SZHM Trust)
www.sufimaizbhandari.org.bd